প্রথম অধ্যায়

তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল : তাঁর রচনা বহুধা, বিচিত্র ও সুপ্রচুর। তাঁর গল্প গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ, গল্পের সংখ্যা একশত নব্বই। "তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ" তিনখণ্ডে (১ম খণ্ড; জুলাই ১৯৭৫, ২য় খণ্ড, এপ্রিল ১৯৭৬, ৩য় খণ্ড; সেপ্টেম্বর ১৯৭৭) যথাক্রমে ৬৬টি, ৬৫টি ও ৫৯টি গল্প সংকলিত হয়েছে। সম্পাদক-শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। আয়না (১৯৬৩) নারী রহস্যময়ী (১৯৬৭) ও মিছিল (১৯৬৯) গ্রন্থত্রয়ী আত্মকথা ও স্মৃতিরোমন্থনমূলক রচনা বিবেচনা করে বাদ দিয়েছেন।" (১) রবীন্দ্রনাথের মত তিনি জমিদারদের জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষেত্র ত্যাগ করেননি, বরং বলা যেতে পারে যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায়ই জমিদারদের অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও বঙ্কিমের সঙ্গে তারাশঙ্করের রচিত জমিদারদের পার্থক্য দুস্তর। বঙ্কিম সামাজিক কাহিনীতে জমিদারকে নায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁদের বিশাল আভিজাত্য চোখ ধাঁধাঁনি জৌলুসে পরিপূর্ণ। বঙ্কিমের "নায়ক গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ নবযুগের নতুন বুর্জোয়া বিবেকের অধিকারী এবং তাদের জমিদারী গৌরবে বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিকীরণ অনুভবে অসুবিধা হয় না।"(২) তাছাড়া বঙ্কিম নিজে জমিদার সন্তান ছিলেন না। উচ্চপদে চাকরী করে কিছু জমির মালিক হলেও ভূস্বামীর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেননি। সেই সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারগণ প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন হতে পারেননি এবং কলোনিয়াল ইকনমি সৃষ্টি বা ভূস্বামীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীর সংঘাত কিংবা যন্ত্রদানবের এমন উগ্র আকার ধারণ করেনি। রবীন্দ্রনাথের জমিদারগণ যখন সামাজিক বিধানদাতা কিংবা নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, তখন তারাশঙ্করের জমিদারগণ ক্রমশঃ বিলীয়মান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাঁরা নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে উদ্ভ্রান্ত-দিশাহারা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পগুচ্ছের ৮০টি গল্পের মধ্যে ২৮টি গল্পে জমিদারকে প্রধানকরে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু সর্বত্র প্রধান নয়। অন্যদিকে তারাশঙ্করের গল্পগুলির মধ্যে প্রায় ৩৪টিতে জমিদার থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জমিদারগণের ভূমিকাই প্রধান। কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রধান হয়েও গল্পের মোক্ষপ্রাপ্তিতে প্রধান অবলম্বের ভূমিকায় বর্তমান। সমকালীন -মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, আভ্যন্তরীণ বিকার্য, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, শ্রমজীবীদের সচেতনতা, ধর্মঘট, উদ্ভট অবাস্তবতা, যৌন বিষয়ে পক্ষপাত বর্তমান। কিন্তু তারাশঙ্কর গল্প বা উপন্যাসে সর্বত্রই নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব, সাবেক জমিদার বনাম নব্য ব্যবসায়ী, সামন্ততন্ত্রের পরাভব, ধনতন্ত্রের উন্মেষ এবং সেই সঙ্গে রাঢ়ের পল্লীর সাধারণ দরিদ্র পরিশ্রমী অজ্ঞ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন।

জমিদার শ্রেণী

বীরভূমের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কর। শৈশব থেকেই জমিদারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়। তাই জমিদারী প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর প্রতি ছিল তাঁর দ্বিধাবিমিশ্রিত আকর্ষণ। পড়ন্ত জমিদারতনয় তারাশঙ্করের হৃদয়ে জমিদারী-আভিজাত্যের অহংকারটি ছিল জড়িয়ে। এমনকি যখন তিনি আর্থিক দিক দিয়ে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন তখনও তিনি জমিদারী আভিজাত্যের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। জমিদারী দম্ভ এযুগে অর্থহীন, মূল্যহীন একথা উপলব্ধি করলেও সাহিত্য সৃষ্টিকালে জমিদারদের বংশানুক্রমিক সম্মান, মর্যাদা, ঐতিহ্য ও প্রতিপত্তিকে ভুলতে পারেননি। তাই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের প্রতি তিনি সকরুণ সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন বারংবার। প্রাচীন জমিদার ছিলেন অত্যাচারী, ব্যাভিচারী, শোষক কিন্তু এ সবের মধ্যেই আবার জমিদারদের ঔদার্য, দানশীলতা, প্রজাপালন, সমাজসেবামূলক কাজের উদাহরণও কম নেই। তারাশঙ্কর সেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই বোধহয় জমিদারদের শত শত দোষ, ত্রুটি এবং রক্ষণশীল মানসিকতাকে উদার লেখনীর মাধুর্যে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। পতন অবশ্যম্ভাবী জেনেও জমিদারকুলের গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "আমাদের সামাজিক ইতিহাস লেখক ও ঔপন্যাসিকগণ একটা কথা বিশেষ স্মরণে রাখেন না যে, মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত দুই-তিন শতাব্দী জমিদারবংশই প্রদেশের প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যতঃ স্বাধীন অপ্রতিহতপ্রভাব ভূস্বামীকুলের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিতবাৎসল্য, সৌন্দর্যরুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয় জীবনযাত্রা আবর্তিত হইয়াছে" (৩) প্রসঙ্গক্রমে জমিদারী প্রথার উৎস ইতিহাস স্মরণীয়।

১৭৯৩ খ্রীঃ বৃটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এর ফলে বাংলায় ব্যক্তিগত জমির মালিকানা ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের হয় সৃষ্টি। তাঁরা ধীরে ধীরে অর্থে, বিত্তে, শৌর্যে, পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। এই ভূস্বামীরাই অর্থের অহংকারে ও লোভের বশবর্তী হয়ে সমাজে অন্যায় অত্যাচার করে

সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। জমিদারদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও শোষণের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিরীহ অসহায় প্রজাকুল প্রতিবাদের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, কখনও বা বিদ্রোহী হয়। তারাশঙ্করের 'রাজা, রাণী ও প্রজা' 'বরমলাগের মাঠ' ইত্যাদি গল্পে এই সত্যটি ধরা পড়ে। আবার বহু প্রজা এই ভূস্বামীগণের কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। 'রায়বাড়ী', 'ব্যাঘ্রচর্ম', 'পণ্ডিতমশাই' প্রভৃতি গল্প এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিগত কয়েক শতকে জমিদারগণ জাতির মুখপাত্র-নেতা হিসেবে সমাজ সাহিত্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছেন। তারাশঙ্কর পরম আগ্রহে এদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

বংশানুক্রমে অর্জিত বিপুল অর্থ ও আধিপত্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়েছে। জমিদারগণের নিজ চারিত্রিক দোষ, নানা উদ্ভট চিন্তা, অবাস্তব উন্মাদনা, অসৎপ্রবৃত্তি এবং যন্ত্রযুগের পদার্পণ ইত্যাদি কারণে তাঁদের বৈভব বা শক্তির বিনাশ শুরু হয়েছে। এই অস্তমিত অবস্থাতেও অনেকে প্রাচীন স্মৃতি রোমন্থন বা পূর্বপুরুষদের কীর্তি প্রচার করেছেন। ফলে সামান্য প্রজাদের কাছেও তাঁরা হাস্যাস্পদ হয়েছেন। 'সাড়ে সাত গণ্ডার' জমিদার এর প্রমাণ।

তারাশঙ্কর কেবল এই জমিদারগণের ধ্বংসের ও প্রতাপের চিত্র অঙ্কন করেই ক্ষান্ত হননি; জমিদারদের জন্যে তাঁর বেদনা, দীর্ঘশ্বাস ও সহানুভূতিরও প্রকাশ মেলে। লাভপুরের ভূস্বামীদের দুঃখ-দুর্দশার দিনে অতীতের অভিজাত অহংকার ও দৃপ্ত পৌরুষের কথাও বলেছেন। দুঃখ অনুভব করেছেন অন্তরে এবং এই অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তারাশঙ্কর সৃষ্ট নব নব ফসল। তিনি বলেছেন "আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল" [৪] এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি অতীত ও বর্তমানকে দুচোখ ভরে দেখেছেন; গ্রামীণ সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যন্ত্রসভ্যতা গ্রামের কৃষিকে কীভাবে গ্রাস করছে, জমিদার এবং নব্য ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বে সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের ধীরে ধীরে অবলুপ্তির কিভাবে পথবাহী— তাও তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত দেখেছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন— "সামন্ততন্ত্র ও জমিদার তন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বে ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার, সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" [৫] সামন্ততন্ত্রের বাহক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার দাপট অটুট রাখতে চান, এরই মাঝে গ্রামে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজন। যাদের ক্রূর দৃষ্টিতে গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধ ভেঙে পড়ে; জমিদারগণ তা সহ্য করতে পারেন না। আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি প্রসূত নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে সমাজ ভাঙতে প্রলুব্ধ করে। ফলে গ্রামের নিরীহ রায়তগণ স্বাধীন হতে চেষ্টা করে—শুরু হয় সংঘাত। ঐতিহাসিক তারাচাঁদ এই সংঘাতের কথা স্বীকার করেছেন, **"There was consequently a clash of interests between the two classes and 'what is more there is nothing in common between them. The new land lords in most cases were businessman who purchased land in search for profitable investment of surplus funds. They were unfamiliar with the affairs of cultivation and were uninterested in the work of agricultural improvement."** [৬]

তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এ পর্বের এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তারাশঙ্করকে জমিদারী তদারকি করতে হয়েছিল। খাজনা আদায়, সুদ নেওয়া, ঋণ দেওয়া বা আদায় করা সবই তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি দেখেছেন গ্রামের রায়তরা কিভাবে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। জমিদারগণ যে, মহাজনী করেন তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। তারাশঙ্করের এক জমিদার আত্মীয় "নিজ বিধবা ভ্রাতৃবধূকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সর্বস্বান্ত করেছে লেখকেরই সম্মুখে" [৭] বিলীয়মান ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের এই জঘন্য অন্যায় দেখেও সহানুভূতি গোপন রাখেননি তারাশঙ্কর, জমিদারদের কোথাও তিনি অযথা প্রশ্রয় দেননি। তাই তো সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘর্ষে সামন্ততন্ত্রের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেছেন। তাই একদিকে "জলসাঘর"এর ঝাড়লণ্ঠনের আলো হয়েছে ম্লান-বিষণ্ণ, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়ী উঠতি ধনী মহিম গাঙ্গুলীর নিজস্ব ডায়নামোর বৈদ্যুতিক আলো ঝকঝক করে জ্বলতে থাকে। বাঈজীকে বকসিস্ দিতে বিশ্বম্ভরের সোনার বাক্স নিঃশেষ হয়ে যায়, অথচ মহিম গাঙ্গুলী অনায়াসে নগদ টাকার তোড়া ছুড়ে দিতে কসুর করে না।

তারাশঙ্কর জমিদার শ্রেণীর উত্থান-পতন দেখেছেন, তাদের সঙ্গী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কতখানি সমাজতত্ত্বঘটিত বাস্তবতায় আশ্লিষ্ট হয়েছে সেই আলোচনাই মুখ্য। কারণ তাঁর থেকে তাঁর সৃষ্টিই বাঙালীর মূল্যবান ঐতিহ্য।

তারাশঙ্করের জমিদার সংশ্লিষ্ট গল্প অনেক আছে—কোথাও মুখ্য, কোথাও গৌণ; কোথাও নেপথ্যে, কোথাও তাঁরা প্রকাশ্যে; কোথাও যশস্বী হৃদয়বান, আবার কোথাও সুদখোর, লোভী, ব্যাভিচারী ও অত্যাচারী।

নীচে জমিদার সংশ্লিষ্ট গল্পগুলির তালিকা দেওয়া যাক—

তালিকা — (ক)

১) শ্মশানের পথে।
২) রাজা, রাণী ও প্রজা।
৩) খড়্গ।
৪) ট্যারা।
৫) পুরোহিত।
৬) জলসাঘর।
৭) মুখুজ্জেমশাই।
৮) বিষধর।
৯) কুলীনের মেয়ে।
১০) রাখালবাঁড়ুজ্জে।
১১) রঙীন চশমা।
১২) সমুদ্রমন্থন।
১৩) ইস্কাপন।
১৪) রায়বাড়ি (পত্তনিদার)।
১৫) ব্যাঘ্রচর্ম।
১৬) পণ্ডিতমশাই।
১৭) নুটু মোক্তারের সওয়াল।
১৮) প্রতিমা।
১৯) রাজপুত্র
২০) সন্তান।
২১) ইতিহাস।
২২) মধুমাষ্টার।
২৩) না।
২৪) মালাকার।
২৫) বন্দিনীকমলা।
২৬) পিঞ্জর।
২৭) হরিপণ্ডিতের কাহিনী।
২৮) শেষকথা।
২৯) সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার।
৩০) আরোগ্য।
৩১) বরমলাগের মাঠ।
৩২) জন্মান্তর।
৩৩) রসকলি।
৩৪) মা, (সাময়িক পত্রে "ফল্গু")।
৩৫) পাটনী।
৩৬) দেহের প্রদীপে রূপের শিখা।
৩৭) আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী।
৩৮) তৃষ্ণা।
৩৯) বিষপাথর।
৪০) সনাতন।
৪১) সর্বনাশী এলোকেশী।
প্রভৃতি।

সাধারণতঃ জমিদারী-বিমিশ্রিত গল্পতে জমিদারের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগণ্য, তবে এইসব গল্পে জমিদার একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—সন্দেহ নেই; কিন্তু কোন কোন গল্পে জমিদার বর্তমান থাকলেও তাঁদের নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই। যেমন—

ক) রসকলি ঃ— এই গল্পটি মূলতঃ বৈষ্ণব নায়ক-নায়িকা সংশ্লিষ্ট। জমিদার থাকলেও তাঁর নাম বা পদবীর কোন উল্লেখ নেই। কেবল কাছারীতে গ্রাম্য সালিসির বিচারকের ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত। তিনি পুলিনের জরিমানা করেছেন এবং মঞ্জুরীকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মঞ্জুরী রাজী না হওয়ায় জমিদার তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কাছারীতে জমিদার সপার্ষদ উপবিষ্ট এবং এখানে তাঁর ইতর ভাষায় সংলাপ শোনা যায়। জমিদারের চরিত্র-ভ্রষ্টতার ইঙ্গিত এই গল্পের মূল কথা।

খ) শ্মশানের পথে ঃ— এই গল্পটিও সাধারণ বৈষ্ণব চরিত্র-ভিত্তিক । জমিদারের নাম, ধাম, পদবীর নেই উল্লেখ। কেবল তাঁর পেয়াদার উল্লেখ আছে। পেয়াদা টাকা আদায় করতে এসে দরিদ্র গোষ্ঠর জীর্ণ গৃহ লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই এখানকার জমিদারের অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক ও শোষক চরিত্রের পরিচয় মেলে।

গ) খড়্গ ঃ— মোঙ্গল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে ঢেকার রামজীবন রায় বিশাল জমিদার ছিলেন। বর্তমানে জমিদারী ধ্বংসের পথে। রামজীবন রায়ের বংশধর এই গল্পের রাজাবাবু শিক্ষিত। তিনি ওকালতি করেন। রাজাবাবু পরোপকারী এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ঘ) ট্যারা ঃ— গল্পটি এক বাউরি তোতলা ছেলের কাহিনী। এখানে জমিদার ভবানীরঞ্জন রায় উচ্চশিক্ষিতঃ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নিয়ে মজলিস করেন এবং দেশ বিদেশের যুদ্ধের খবরাখবর নিয়ে আলোচনা করেন। এই গল্পে তাঁর চকিতে আবির্ভাব।

ঙ) কুলীনের মেয়ে ঃ— গল্পটি মূলতঃ এক বিধবার বেদনাবিধুর করুণ কাহিনী। এখানে দু'জন জমিদারের নামোল্লেখ আছে। একজনের আছে শিক্ষাদীক্ষা, তিনি পরোপকারী, কিন্তু তাঁর ভূমিকা নগণ্য। অন্য জমিদারের ভূমিকা প্রায় শূন্য।

চ) ব্যাঘ্রচর্ম ঃ— এ গল্পটির প্রধান চরিত্র রতনহাড়ি। জমিদার হেমাঙ্গবাবু, অথচ তাঁর পদবীর উল্লেখ নেই। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত। হেমাঙ্গবাবু খামখেয়ালী, তাঁর শখ—কুকুর পোষা।

ছ) পণ্ডিতমশাই ঃ— এখানে প্রধান চরিত্র ব্রাহ্মণ যতীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী কাকপণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। জমিদার গল্পটির মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয়েছেন, কিন্তু তাঁর নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই।

জ) সন্তান ঃ— এখানে জমিদারের নাম লক্ষ্মীবাবু, কিন্তু তাঁর পদবীর উল্লেখ নেই। এই চরিত্রটি সাদাসিধে, কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আভিজাত্য-গর্বী।

ঝ) ইতিহাস ঃ— এখানে জমিদারের নাম, পদবী বা ভূমিকা নেই, কেবলমাত্র পাত্র হিসেবে উল্লেখ আছে। তিনি বি. এ. পাশ এবং বিপত্নীক।

ঞ) পিঞ্জর ঃ— এখানে জমিদারের নাম নেই। তিনি নাট্যমোদী, স্বার্থান্বেষী। গল্পে তাঁর ভূমিকা নগণ্য।

চ) রাজপুত্র ঃ— এই গল্পের নায়ক বিশ্বনাথ রায়। ইনিও মোঙ্গল আমলে ঢেকার বিখ্যাত জমিদার রামজীবন রায়ের বংশধর। বিশ্বনাথ বর্তমানে সর্বস্বান্ত। কিন্তু এই দারিদ্র্য কেমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ গল্পে নেই।

ছ) শেষকথা ঃ— এই গল্পে জমিদারের পদবী ও পেশার উল্লেখ থাকলেও নাম নেই। ভূমিকা নগণ্য।

জ) বরমলাগের মাঠ ঃ— এখানে বিষজর্জরিত বরমলাগের মাঠ জমিদারের কাছ থেকে ক্রয় করেন সমাজতন্ত্রী শিবনাথ। এখানে জমিদারের নাম ও পদবীর উল্লেখ নেই।

ঝ) পাটনী ঃ— এই গল্পে জমিদারের স্বপ্রকাশ নেই, তবুও শ্মশানের জমির মালিক বলে মৃতদেহ সৎকারে যা লাভ হবে জমিদার তার ১/২ অংশ বখরা পাবেন। শিবলোকে কাজ করার প্রেক্ষাপটে জমিদারের Capitalistic মনোভাব সক্রিয়।

জমিদার সংশ্লিষ্ট গল্পগুলিকে আবার ৪টি পর্বে ভাগ করা যায় ঃ—

ক বর্গ	।।	জমিদার-প্রধান গল্প
খ বর্গ	।।	জমিদার বর্তমান থাকলেও প্রধান নন।
গ বর্গ	।।	জমিদারগণ অপ্রধান হয়েও গল্পের রসসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছেন।
ঘ বর্গ	।।	জমিদারী ও ব্যবসা একই সঙ্গে বর্তমান

তালিকা দুই

'ক' বর্গ

	গল্প	প্রধান চরিত্র
১।	রাজা, রাণী ও প্রজা।	লেখক তারাশঙ্কর স্বয়ং।
২।	জলসাঘর।	বিশ্বম্ভর রায়।

৩।	রাখাল বাঁড়ুজ্জে	স্বয়ং
৪।	রঙীন চশমা	বড়কর্তা (মদ-মাংস খান না।)
৫।	সমুদ্রমন্থন	উমানাথ
৬।	রায়বাড়ি	রাবণেশ্বর রায়।
৭।	পুত্রেষ্টি	গণেশ বাঁড়ুজ্জে।
৮।	নুটু মোক্তারের সওয়াল	বড়কর্তা মুখুজ্জে।
৯।	রাজপুত্র	বিশ্বনাথ রায়—বর্তমানে জমিদারী নেই।
১০।	মা	মহাবিষ্ণু সরকার
১১।	সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার	বনবিহারী সরকার।
১২।	জন্মান্তর	বলরাম চাটুজ্জে।

তালিকা - তিন

'খ' বর্গ

১।	শ্মশানের পথে	জমিদারের উল্লেখ নেই (শোষক)।
২।	খড়্গ	রাজাবাবু (রায়)।
৩।	রসকলি	নাম, পদবী নেই (ব্যভিচারী)।
৪।	বিষধর	বিনয়কৃষ্ণ রায় (জমিদার ও সঃ চাকুরে, অবসরপ্রাপ্ত, চরিত্রহীন।
৫।	কুলীনের মেয়ে	কৃষ্ণবাবু এবং যোগীন্দ্র গাঙ্গুলী।
৬।	ট্যারা	ভবানীরঞ্জন রায়।
৭।	ইস্কাপন	নাম উল্লেখ নেই, স্বল্প জমির মালিক।
৮।	ব্যাঘ্রচর্ম	হেমাঙ্গবাবু, উচ্চশিক্ষিত ও শৌখিন।
৯।	পণ্ডিত মশাই	নাম উল্লেখ নেই।
১০।	প্রতিমা	অমূল্য চ্যাটার্জী, মদ্যপ।
১১।	ইতিহাস	জমিদারী আছে কিন্তু নাম উল্লেখ নেই।
১২।	না	অনন্ত।
১৩।	মালাকার	রাম রায়।
১৪।	পিঞ্জর	নাম উল্লেখ নেই।
১৫।	হরিপণ্ডিতের কাহিনী	রায়বাহাদুর, ভূমিকা নগণ্য।
১৬।	পাটনী	অনুল্লিখিত।
১৭।	মধুমাষ্টার	জ্ঞানদা রায়।

তালিকা - চার

'গ' বর্গ

	গল্প	প্রধান চরিত্র
১।	পুরোহিত	বিমল রায়।
২।	সন্তান	লক্ষ্মীবাবু।

৩।	বন্দিনী কমলা	তিন ভাই।
৪।	শেষ কথা	সাউ ও সাঁই দুই জমিদার।
৫।	আরোগ্য	মুখার্জী ও চ্যাটার্জী
৬।	বরমলাগের মাঠ	নাম উল্লেখ নেই।
৭।	অগ্রদানী	শ্যামদাস
৮।	সর্বনাশী এলোকেশী	জমিদার নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই।

তালিকা - পাঁচ

'ঘ' বর্গ

১।	পুরোহিত	বিমল রায়, কলিকাতায় ব্যবসা।
২।	মুখুজ্জে মশাই	হীরেন্দ্র, ঐ
৩।	শেষ কথা	সাউগণ ব্যবসায়ী

এখন তালিকাভিত্তিক আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

তালিকা - দুই

'ক' বর্গ

১) রাজা রাণী ও প্রজা ঃ— গল্পটি একটু অভিনব। উত্তম পুরুষের বাচনিকে লেখা। জমিদার স্বয়ং লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃটিশ সরকারের চাপে দিনে দিনে বর্ধিত রাজস্ব পরিশোধ করতে অনেক জমিদার হিমসিম খেয়েছেন। অনেক জমিদারের কাছে পৈতৃক ক্ষুদ্র জমিদারী গলগ্রহ হয়ে উঠেছে।

"পৈতৃক ক্ষুদ্র জমিদারী কঠিন পেষণে গলায় চাপিয়া বসিয়াছে। জমিদারী এখন হইয়াছে হয়রানি। সরকারের সদরে এক একবার রাজস্ব দাখিলের সময় হয় আর নিখিল ভুবন অন্ধকার হইয়া উঠে।" [৮] জমিদার খাজনা আদায় করতে যান কিন্তু প্রজারা খাজনা দিতে নারাজ। তাই লেখক বিদ্রোহী প্রজাদের মোড়লের কাছে যান। মোড়ল নিভৃতে জমিদারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাণীমার কাছে সপরিবারে আশ্রয় নেয়। রাণীমার মাতৃসুলভ আচরণ ইত্যাদি হল গল্পটির সারবস্তু। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটককে স্মরণ করায়। এই গল্পটি লেখকের যে আত্মজীবনীমূলক রচনা তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন "গল্পের রাজা আমি, রাণী আমার গৃহিণী, প্রজা যে, সে রাধাবল্লভ, সেও আমার মতো বাস্তব সত্য। ঘটনাটি পনেরো আনা সত্য।" [৯]

২) সমুদ্রমন্থন ঃ— এখানেও সরকারী খাজনার টাকা পরিশোধ করতে জমিদার উমানাথ উদ্‌ভ্রান্ত। দেশ জোড়া দুর্ভিক্ষ, পথে ঘাটে ভিখারীর আনাগোনা। উমানাথের স্ত্রী বাপের বাড়ীর সুবাদে বহু অর্থের অধিকারিণী। দু-একবার এই বিপদ থেকে উমানাথকে তিনি উদ্ধার করেছেন। এবারে তিনি নারাজ। অথচ খাজনা প্রদানের দিন সমাগত। উমানাথ তাই রাতের অন্ধকারে স্ত্রীর গয়না চুরি করতে উদ্যত হন কিন্তু হঠাৎ এক শব্দ শুনে বন্দুক নিয়ে নীচে নামেন, সঙ্গে স্ত্রীও আসেন। এসে দেখেন দিনের বেলায় ভিক্ষে করতে আসা শীর্ণ ভিখারিণীটি ছাগলচুরি করতে এসেছে। কারণ ডাক্তার তার অসুস্থ স্বামীকে মাংস খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে অথচ সে অর্থহীন, তাই চুরি করতে এসেছে। স্বামীর প্রতি এই ভিখারিণীটির ভক্তি দেখে উমানাথের স্ত্রী রমাদেবীর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে; তিনি উমানাথকে নতুনভাবে গ্রহণ করেন।

৩) জলসাঘর ঃ— সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নবীন ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বের সার্থক রূপায়ণ "জলসাঘর" ও "রায়বাড়ি" গল্প দুটি। 'জলসাঘর' গল্পের নায়ক জমিদার বিশ্বম্ভর রায় ব্যবসায়ীর সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে ক্ষয়িষ্ণু অবসানমুখী অতীতের প্রদীপ্ত শিখাটিকে শেষবারের মত জলসাঘরের দরজা খুলে ধরতে চেয়েছেন। "তাঁর রচনায় জমিদার সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষ রশ্মির 'অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে উঠেছে।" [১০] তিন পুরুষ ধরে রায়বংশের প্রভুরা করলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষে রাজত্ব, পঞ্চম পুরুষে ভোগ,

ষষ্ঠ পুরুষে হল ঋণ এবং সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলে রায়বাড়ীর লক্ষ্মী ঋণের সাগরে ডুবে গেলেন। তা সত্ত্বেও বিশ্বম্ভর তাঁর জমিদারী আভিজাত্যকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে পুরাতন আভিজাত্য যেন পুনরায় নতুনভাবে জেগে উঠল। ঝাড়লণ্ঠনের বাতি সব জ্বলে উঠল কিন্তু বিধাতার নির্মম পরিহাসে সপ্তমদিনে কলেরায় প্রিয়তমা পত্নী, পুত্রদ্বয় এবং কন্যাটির অকালপ্রয়াণ ঘটল। টিকে রইল শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী ছোটগিন্নী (হস্তিনী) আর তুফান (অশ্ব)। বিশাল অট্টালিকার এক কোণে আলোহীন অন্ধকারে বসে থাকেন ঋণভারে জর্জরিত প্রবীণ বিশ্বম্ভর রায়।

অন্যদিকে নতুন গজিয়ে ওঠা ধনী মহিম গাঙ্গুলীর সোনার দেউল ওঠে আধুনিক ধাঁচে। উৎসবে ব্যান্ড বাজে, ঝকঝকে মোটর গাড়ী ধুলো উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় অথচ এই গাঙ্গুলীর বংশই রায়বাবুদের এলাকায় মহাজনী করেছে। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য, অন্যদিকে নব্য শ্রেষ্ঠীর দম্ভ এই গল্পে মুখোমুখি সংঘাতের রূপ নিয়েছে। নব্য ধনী গাঙ্গুলীদের জেদ, যেমন করেই হোক বিশ্বম্ভরের ওই মরা পাহাড়ের চূড়া ভাঙবেই। মহিম বাঈজী নাচের আসর বসায়। নিমন্ত্রণ করে বিশ্বম্ভরবাবুকে। উদ্দেশ্য তার রায়বাবুকে আঘাত দেওয়া। রায়বাবু ছোটগিন্নীর সাথে নায়েবকে একটি মোহর দিয়ে আমন্ত্রণ বাড়ী পাঠান। রায়বাবু যান না। অনুষ্ঠান শেষে মহিম বাঈজীকে বলে যে সে যেন রায়বাবুর বাড়ী হয়ে যায়। বাঈজীকে দেখেই রায়বাবু মহিমের দুরভিসন্ধি ধরে ফেলেন। শেষবারের মত তিনি জলসাঘরের দরজা খুলে দেন। বাঈজীর নৃত্যে, আলোর রোশনাই-এ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় জলসাঘর জৌলুসে ভরে উঠল। বকশিস্ দিতে রায়বাবুর গয়নার বাক্স শেষ হয়। প্রমত্ত রজনী শেষে প্রত্যুষে আদরের ঘোড়া তুফানের পিঠে সওয়ার হয়ে উদ্ভ্রান্ত বিশ্বম্ভর ছুটে যান যে কীর্ত্তিহাটে তা অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। ফিরে আসেন জলসাঘরের দিকে। তাঁর হাতের চাবুকটা সশব্দে আছড়ে পড়ে জলসাঘরের দরজায়। পূর্বপুরুষদের দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পান 'মোহ। কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে (জলসাঘর)। ভৃত্যদের বাতি নিভিয়ে দিতে বলেন এবং সবশেষ হয়ে যায়। অতীত-আভিজাত্য-দম্ভ গর্ববাহী বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সংঘর্ষে একালের ব্যবসাদার ধনী মহিম গাঙ্গুলীর জয়লাভই জলসাঘরের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'সাত পুরুষ ধরে রায়দের ধারাবাহিক ভোগবিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং মোহই যে রায়বংশের পতনের একামাত্র কারণ তা কিন্তু নয়। এ এক অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি।" (১১)

৪) রায়বাড়ী ঃ— এই গল্পের নায়ক দীর্ঘকায় প্রশস্ত বক্ষ, সিংহের মত বলিষ্ঠ বিক্রম রাবণেশ্বর রায়। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী দশকের ঘটনা। জমিদারের বয়স চল্লিশ। দয়ামায়াহীন, শাক্ত তান্ত্রিক, বহু সম্পত্তি ও অতুল ঐশ্বর্যের মালিক রাবণেশ্বর। জমিদারী দাপটে ও গোমস্তার অত্যাচারে হুদ্দা শ্যামপুরের বিদ্রোহী প্রজারা গোমস্তাকে ফুটন্ত গুড়ের কড়াইয়ে ফেলে পুড়িয়ে মারে; সেই অপরাধের চরম শাস্তি দিতে রাবণেশ্বর লেঠেল কালী বাগ্দীকে হুদ্দাশ্যামপুর লাট পুড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী (বৈষ্ণববংশীয়া কন্যা) ব্রজরাণী বাধা দিলেও কোন ফল হয় না। পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ছত্রিশ মৌজা। ছোট বোনের বিয়ে থেকে বাড়ী ফেরার পথে গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে-ব্রজরাণী পুত্রসহ মারা যান। রাবণেশ্বর নির্বংশের আশঙ্কায় তারানাম জপ করতে থাকেন। সংসার ত্যাগের সংকল্প নেন তিনি। হঠাৎ গঙ্গার বাঁধ ভেঙে প্রবলবন্যার জল জমিদারী এলাকায় প্রবেশ করে। আশ্রয়হীন প্রজাদের জন্যে রাবণেশ্বর জলসাঘর খুলে দেন। গ্রাম্য এক বালিকার বিয়ের আসরও বসে জলসাঘরে। এই চরম দুর্যোগের রাত্রে বিয়ের অনুষ্ঠান রাবণেশ্বরের জীবনে এক গভীর অর্থবহ ইঙ্গিত বলে মনে হয়। কারণ সংসার পরিত্যাগের বাসনা দূরীভূত হয়। রাবণেশ্বর আবার সংসারে ফিরে আসেন। নির্বংশ হবার জন্যে রায়বংশকে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি মূলে ঘুন ধরেছে এই ধ্রুব সত্যটি তারাশঙ্করের অজানা ছিল না, তবুও অতীতের স্মৃতিবহুল গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলি লেখককে আনন্দ দিত্ আবার জমিদারদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলির জন্যে তিনি বেদনা অনুভব করতেন। "সেকালকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ, তার স্খলন, আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত।" (১২) সেই সময় অভিজাতগণ কেবল পীড়নক ছিলেন না, তাঁরা প্রজাশাসনে, আশ্রয়হীনে আশ্রয়দানে, প্রতিপালনেও রাজসিক ছিলেন। "তাঁর (রাবণেশ্বর) চিত্তে আসক্তি অনাসক্তির লীলা মনস্তাত্ত্বিক আলো আঁধারিতে অনবদ্য।" (১৩) কিন্তু অসঙ্গতিও ছিল, "একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই অসঙ্গতিই সেই যুগের জমিদার শ্রেণীর চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে তুলেছে। ঔদার্যের সঙ্গে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণে রাবণেশ্বর চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।" (১৪) সামন্তদের প্রতি একধরণের শ্রদ্ধা সর্বদাই তারাশঙ্করের হৃদয়ে সংগুপ্ত ছিল, যা ছিল সে যুগের সামন্তযুগীয় বংশগতির ঐতিহ্য। তারাশঙ্কর নিজেই তা স্বীকার করেছেন। "জীবনে বংশগত শিক্ষায় অতীতকে, পুরাতনকে অসম্মান করতে কোন কালেই পারি না বা পারিতাম না।" (১৫)

৫) রাখাল বাঁড়ুজ্জে ঃ— বার্ষিক এক হাজার টাকা আয়ের জমিদার রাখাল বাঁড়ুজ্জে। তিনি স্বভাবদুর্বৃত্ত, যেমন লোভী তেমন শয়তান। অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল তবুও কদর্য লোভ তাঁকে হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। "গঙ্গাজল"

পাতানো সখা হারাণের কাছ থেকে রাখাল জানতে পারে যে পাশের গাঁয়ের অবস্থাপন্না বিধবা হৈমর সৎ কন্যা লক্ষ্মীকে ঘরের পুত্রবধূ করে আনতে পারলে অনেক বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করা যাবে। পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েও সম্পদ হাতে পান না রাখাল। হৈম স্থানীয় মহাজন জ্ঞানাঞ্জন দত্তের কাছে সম্পত্তি জীবনসত্ব লিখে কাশীবাসী হন। গল্পের অন্তিম অনুচ্ছেদে বাঁড়ুজ্জের পাশবিক হিংস্রতা প্রকট হয়েছে। হৈমর শূন্য ঘরে একটি বিড়াল বাঁড়ুজ্জের দিকে হিংস্রভাবে গর্জন করে এগিয়ে আসে। বাঁড়ুজ্জে দরজার ফাঁক দিয়ে তা দেখতে থাকে, হঠাৎ বিড়ালটা দরজার ফাঁকে মুখ ঢোকানো মাত্র বাঁড়ুজ্জে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরেন দরজা দিয়ে। বেড়ালটাকে মেরে ফেলেন। "এই প্রতীকী বিবরণ ছোট গল্পের ব্যঞ্জনাগর্ভ সংকেত ভাষণের অপূর্ব নিদর্শন। রাখাল বাঁড়ুজ্জের হিংস্র পশু স্বভাবের বীভৎস স্বরূপ উন্মোচনে এ যেন অভিনব চরিত্র স্রষ্টা বাণী শিল্পীর শেষ তুলির টান।" (১৬)

৬) রঙীনচশমা ঃ— এই গল্পে বড়কর্তা পড়ন্ত জমিদার। সুন্দরী অথচ শ্বেতকুষ্ঠ রোগাক্রান্তা কন্যার বিয়ে উপলক্ষে স্বভাবদুর্বৃত্ত রাইকিশোর পাত্রপক্ষের কাছে বিয়ে ভাঙার ষড়যন্ত্র করে কিন্তু কন্যার বিয়ে হয়ে যায়। চৌধুরীদের ঐতিহ্য অনুযায়ী, বড়কর্তা ফলবৃক্ষসমেত ভূমি ব্রাহ্মণ হিসেবে রাইকিশোরকেই দান করেছে। এখানে দুই জমিদারের উদারতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৭) পুত্রেষ্টি ঃ— এই গল্পের জমিদার শাক্ততান্ত্রিক গণেশ বাঁড়ুজ্জে পুত্র কামনায় দিশাহারা। গণেশের স্ত্রী এক পোষ্য নেন। গণেশ নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে পোষ্যপুত্র অপেক্ষা নিজপুত্র পেতে চান। হঠাৎ এক তান্ত্রিক সাধুর সংস্পর্শে এসে সাধুর পরামর্শ অনুযায়ী নরবলির জন্যে এক রাত্রে গণেশ মেজো গিন্নীর পোষ্য পুত্রটিকে চুরি করতে আসেন, কিন্তু পথে এক কুক্করীকে দেখে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে এবং ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। "গল্পটি মূলতঃ চরিত্রধর্মী। মেজকর্তার চরিত্রের আপাত পুরুষতার অন্তরালে সুপ্ত স্নেহবৃত্তি, পুত্র কামনার জন্যে অপরের পুত্রকে বলি দেওয়ার যে অপরাধ প্রবণতা জেগে উঠেছে, সেই সঙ্গে পুত্রহারা কুক্করীর আর্তনাদ, অমাবস্যার রহস্যাচ্ছন্ন, ভীতি-শিহরণ প্রভৃতি ঘটনা গল্পটিকে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে উন্নীত করেছে।" (১৭)

৮) নুটু মোক্তারের সওয়াল ঃ— অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা তারাশঙ্করের এই গল্পটি বাস্তব এবং অপূর্বসৃষ্টি। নুটুর বাস্তবতা সম্পর্কে তারাশঙ্কর বলেছেন, "নুটু মোক্তার কল্পনার মানুষ নয়, সত্যকারের মানুষ। রামপুরহাট সাবডিভিশনের লোক। প্রথমে ছিলেন ইস্কুল-মাস্টার, তারপর হয়েছিলেন মোক্তার। সে আমলের বিচিত্র স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন।" (১৮) বি. এ. পাশ নুটু বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জমিদার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়ে নুটুর স্ত্রী অপমানিতা হন। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে নুটু শিক্ষকতা ছেড়ে মোক্তারি পাশ করে আদালতে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। "কলিযুগের দুর্বাসা" নুটুর প্রতিজ্ঞা হল যে কঙ্কনার জমিদারদের ঘরের ঐশ্বর্য লক্ষ্মীকে পথে নামানো। কিন্তু উকিলের ব্যর্থতায় প্রথম মামলায় নুটু মোক্তার পরাজিত হন। রাগে, ক্ষোভে নুটু নিজেই ওকালতি পাশ করেন এবং মামলায় অকাট্য সওয়াল করে জয়ী হন। অর্থ ও পসার দিনে দিনে বাড়তে থাকে; নুটুর চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে; নুটু দরিদ্রকে ঘৃণা করতে শুরু করেন। এই সময় কঙ্কনার মুখুজ্জেদের বড়কর্তা তাঁর নাতনীর সঙ্গে নুটুর বড় ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও নুটু বিয়েতে রাজী হন। শুভদিনে বিয়ে হয়ে যায়। নুটুর তীক্ষ্ণ বক্তৃতা ও শ্লেষ চারিত্রিক মাধুর্যকে বাড়িয়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত আভিজাত্য-মর্যাদার মোহের কাছে, নিজেকে বন্দী করে ফেলেন। মা লক্ষ্মীর চরণকে পথে নামাবেন বললেও সেই লক্ষ্মীকেই নুটুবিহারী মাথায় চাপান। দরিদ্র-আত্মীয়দের অবজ্ঞা করে নুটু নিজ চরিত্রের গোপন বীজটিকে তুলে ধরেছেন।

৯) রাজপুত্র ঃ— গল্পের নায়ক বিশ্বনাথ রায় প্রাচীন আমলের বিশাল জমিদারের বংশধর। বর্তমানে ভীষণ গরীব। বিনাপথ্যে পুত্র মারা যায়। গ্রামে অভিনয় শিখিয়ে কোনরকমে সংসার চালান তথাপি দুঃখ প্রকাশ করেন না। শেষে উদাসী বিশ্বনাথ 'ক্যারিকেচার' হয়ে যান। মানবজীবনে কি অভাবনীয় পরিবর্তন চকিতে সাধিত হয়ে যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "রাজপুত্র" গল্পটি। অবশ্য বিশ্বনাথ কেমন করে দরিদ্র হয়েছেন তার উল্লেখ নেই।

এই গল্পে নতুন গজিয়ে ওঠা জমিদার ঘোষবাবুর উল্লেখ আছে।

১০) মা ঃ— প্রথমে গল্পটির নাম ছিল 'ফল্গু'। এখানে বিলীয়মান জমিদার মহাবিষ্ণু সরকার। প্রথমা স্ত্রীকে সন্দেহের বশে গলা টিপে হত্যা করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। মহাবিষ্ণুর দুই পুত্র। বড়টি দাম্ভিক ও উগ্র। প্রজাহত্যার দায়ে দ্বীপান্তর হয়েছে। ছোটটি বি. এ. পাশ করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং তার ফাঁসি হয়। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মহাবিষ্ণু মৃত্যুর চরম মুহূর্তে স্ত্রী হত্যার কথা স্বীকার করেন। কর্মফলবাদকে অর্থাৎ ভারতীয় সনাতন আদর্শকে স্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর। তাই তাঁর সাহিত্যে একদিকে যেমন আদিমতার তীক্ষ্ম প্রকাশ আছে তেমনি অন্যদিকে আছে আদর্শবাদের সংহত প্রশান্তি— সব মিলিয়েই তারাশঙ্কর বিশাল ও ব্যাপক। বাংলা সাহিত্যে এমন বস্তুবৈচিত্র্যের তুলনা মেলা ভার।

১১) সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার ঃ— এই গল্পে আছে নির্বিষ সর্পের নিষ্ফল গর্জন। জমিদারী দাপট শূন্য; বিত্তহীন জমিদার বনবিহারী সরকার। অবস্থাহীন বলে তাঁকে প্রজারাও অবজ্ঞা করে। সন্তানহীন, বিপত্নীক বনবিহারী এক ভাগ্নেকে মানুষ করেন। ভাগ্নে রমেন বর্ধমানের কাটোয়ায় শিক্ষকতা করে। সাড়ে সাত আনির জমিদারী বর্তমানে লোকসানের দিকে ঝুঁকেছে, সেই সঙ্গে প্রজাদের অবজ্ঞাসুলভ আচরণ ইত্যাদি দেখে রমেন মামাবাবুকে জমিদারী বিক্রির পরামর্শ দেয় এবং তখনই শুরু হয় মামা ও ভাগ্নের সংঘাত। পরিশেষে বৃদ্ধ বনবিহারী কাশী যাত্রা করেছেন। প্রথম পুরুষের শৌর্য কবেই অস্তমিত — আজ শুধু বেলা শেষের হাহাকার। এ অবক্ষয় তারাশঙ্কর নিজের গ্রামেই দেখেছেন। বীরভূমের জমিদারীর বৈশিষ্ট্য হল — ক্ষুদ্র আয়তন এবং সংখ্যাধিক্য। তথাপি তাঁদের পরাক্রম কম নয়। "তাঁরা বলতেন, মাটি বাপের নয়, দাপের, দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।" বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবী ঘোষণা করতেন" [১৯] এবং ক্ষুদ্র জমিদারগণ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন। তারাশঙ্করের জীবনেও এই ঘটনা ঘটেছিল। "আমার কালের কথা"য় বলেছেন "সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" [২০]

১২) জন্মান্তর ঃ— এখানে জমিদার বলরাম চ্যাটার্জী গ্রামের প্রধান। তিনি মারা যাবার পর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তানা হৈম দাপটের সঙ্গে জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৬১ আইনে জমিদারী চলে যায়। প্রথম পক্ষের উচ্ছৃঙ্খল পুত্র নীলুকে সব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু নীলুর শিশুপুত্রকে দেখে আবার সংকল্প ত্যাগ করে হৈম সংসারে ফিরে আসেন। সন্তানহীনা হৈম-র বুভুক্ষু হৃদয়ের হল জন্মান্তর ।

তালিকা - তিন

'খ' বর্গ

এই পর্যায়ে গল্পগুলিতে জমিদার বর্তমান থাকলেও প্রধান নন। কাহিনীর প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এধরণের কিছু গল্প প্রথমেই আলোচিত হয়েছে।

১) বিষধর ঃ— এই গল্পের জমিদার "সাত আনির জমিদার রায়বাড়ির এক আনির অর্ধেকের মালিক" বিনয়কৃষ্ণ রায়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। সর্বদা মুখে আদর্শের বুলি ও অন্যকে সন্দেহ করা বা সমালোচনা করা তাঁর স্বভাব। তাই নিজে অসৎ, ভ্রষ্ট চরিত্রের হয়েও হরেণের মত শুদ্ধ চরিত্রকেও সন্দেহ করেন। সর্বদা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন। হরেণ রায়ও জমিদার। তিনিও 'সাত আনির এক আনির মালিক। একদিন হরেণ এক অপরিচিত বালকের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ঐ বালকের মা এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। মাকে বাড়ী থেকে নিয়ে কলকাতায় রাখেন বর্তমানে মা নেই কিন্তু মা বলে গেছেন সেই ভ্রষ্ট ও দুষ্ট চরিত্র হলেন বিনয়কৃষ্ণ রায়। মুখে আদর্শের বুলি, গায়ে ছদ্মবেশে নামাবলীর আচ্ছাদন দিয়ে সমাজের শিরমণি হয়ে থাকতে চেয়েছেন অনেক জমিদার অথচ ভেতরে তাঁদের মত কদর্য চরিত্রের মানুষ আর হয় না। তাদেরই একজন হলেন বিনয়কৃষ্ণ রায়।

২) ইস্কাপন ঃ— এই গল্পের প্রধান চরিত্র ইস্কাপন। বয়স চল্লিশ— মদ্যপ, চোর, দাগী আসামী। নাম ধাম পিতৃপরিচয় সবই অজ্ঞাত। এখানে যে জমিদারের উল্লেখ আছে তাঁকে যথার্থ অর্থে জমিদার বলা যায় না, সামান্য জমির মালিক বলা চলে। ভূমিকা নগণ্য।

৩) প্রতিমা ঃ— প্রতি বছরের মত কুমারিশ মিস্ত্রী দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে জমিদার বাড়ীতে যান। ছোটবাবু অমূল্য চ্যাটার্জী মাতাল, অত্যাচারী। ছোট বউ যমুনা স্বামীর জ্বালায়, যন্ত্রণায় ক্লিষ্টা অথচ সুন্দরী। কুমারিশ দুর্গা তৈরি করে একেবারে ছোট বউ এর মুখের আদলে। ছোট বউ তা দেখে শিউরে ওঠেন। গ্রামবাসী, স্বামী, অন্যান্যরা প্রতিমা দেখে যমুনাকে কি বলবে, সেই ভয়ে, লজ্জায় ও ঘৃণায় পাশের পুকুরে আত্মহত্যা করেন।

৪) মালাকার ঃ— এখানে প্রধান চরিত্র রজনী মালাকার। তার চারিত্রিক পরিবর্তনের কাহিনীই এই গল্পের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তথাপি সৌন্দর্য প্রিয়, সমঝদার জমিদার প্রতিমার নতুন সাজ দেখে রজনীকে ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা বকসিস্ দিয়েছেন। এই টাকাই রজনীর জীবনের পরিবর্তনে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে।

৫) মধুমাষ্টার ঃ— জমিদার জ্ঞানদাবাবু ঃ দানশীল, শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী। পদবী রায়। মূল ঘটনা এক শিক্ষকের বই লেখার করুণ কাহিনী।

৬) হরি পণ্ডিতের কাহিনী ঃ— এই গল্পে জমিদারের উল্লেখ থাকলেও তাঁর নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই। জমিদার হরি পণ্ডিতের সহপাঠী। জমিদারের কাছারীতে হরি পণ্ডিতের পাঠশালা। এর জন্যে হরি পণ্ডিতকে বিল্বমঙ্গলের নিত্যপূজা করতে হয় এবং জমিদার গ্রামে আসলে, তাঁকে রান্না করতে হয়। এখানে জমিদার অপেক্ষা হরি পণ্ডিতের

মাধ্যমে আদর্শ শিক্ষকের রূপ দেখানো হয়েছে।

৭) না ঃ— জমিদার পুত্র অনন্ত— অনন্ত অল্পশিক্ষিত ও উগ্রস্বভাবের। সে সবসময় বন্দুক হাতে শিকার করে বেড়ায়। অনন্তের পিসতুতো ভাই কালীনাথ, উচ্চশিক্ষিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই ভাই-এর একই সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগ হয়েছিল। কালীনাথ অনন্তের জন্যে কনে হিসেবে ব্রজরাণীকে দেখতে যায়। কিন্তু ব্রজরাণীকে কালীনাথের পছন্দ হওয়ায় বিশ্বাসঘাতকতা করে দুখানি বেনামী পত্র দুই কন্যার পিতাকে দিল। পাল্টে যায় পাত্রী। ব্রজরাণীর সঙ্গেই কালীনাথের বিবাহ হয়। ফুলশয্যার দিন থেকেই অনন্তের দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে অথচ কালীনাথ সুখেই থাকে। অনন্ত সব বুঝতে পেরে ধৈর্য হারিয়ে ব্রজরাণীর সামনেই কালীনাথকে গুলি করে হত্যা করে ঃ গ্রেপ্তার হয় অনন্ত। উন্মাদ হয়ে যায়। দীর্ঘ আট বছর পর আদালতে চূড়ান্ত রায়ের দিনে স্বামী হন্তাকারীকে শাস্তি বিধানের পরিবর্তে ব্রজরাণী অনন্তকে নির্দোষ বলেন। হ্যাঁ, এই শব্দটির মধ্যেই ছিল অনন্তের ফাঁসি অথচ প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়েও ব্রজরাণী বলেন 'না'। প্রতিহিংসা নয় ক্ষমাই হল জীবনের প্রধান লক্ষ্য — মানবের চিরন্তন ধর্ম। "অসৎ থেকে সত্যের পথে, হিংসা থেকে ক্ষমার পথে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যে শুভংকরী প্রকৃতি, আজ তাঁরই জয় হল। ক্ষমা করে দিয়ে ব্রজরাণী বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। পরাজিত হল মানুষের সমস্ত সজ্ঞান প্রয়াস, জয়ী হল শুভংকরী প্রকৃতি।" (২১) এই গল্পের ঘটনাটি বীরভূমের চৌহদ্দীতেই ঘটেছিল। ঘটনাটি কীর্ণাহারের বাবুদের বাড়ীর। "তাঁদেরই একজন এই গল্প প্রকাশের পর তারাশঙ্করের উপর কেস করবো বলে হুমকিও দিয়েছিল।" (২২)

তালিকা - চার

'গ' বর্গ

১) পুরোহিত ঃ— গল্পটিতে একটি তরফ ক্রয় করা নিয়ে বৃদ্ধ পুরোহিত যদু ভট্টাচার্য এর সঙ্গে নবীন জমিদার ও ব্যবসায়ী বিমল রায়ের সংঘাত। অর্থের প্রয়োজনে দেবোত্তর গহনা বিক্রি করতে চান বিমলবাবু কিন্তু পুরোহিত সেই গহনা দিতে অস্বীকৃত হন। বিমলবাবু প্রধান পুরোহিতকে অপমান করতে দ্বিধা করেন না। হঠাৎ একদিন বিমলের স্ত্রী চারুর কঠিন অসুখ হয়। ডাক্তার বাঁচার আশা ছেড়ে দেন। শেষে চারু সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে জানা যায় যে পুরোহিত দীর্ঘ ২৮ দিন উপবাসী থেকে গোবিন্দজীর পূজো করে যান মাত্র একবার হবিষ্যি করে। এই কথা জানার পর রুষ্ট বিমলের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে। পুরোহিত যে তাঁদেরই হিতাকাঙ্ক্ষী তা উপলব্ধি করতে পারেন।

২) বন্দিনী কমলা ঃ— আলোচ্য গল্পটি একটি কিংবদন্তীর প্রতীক আশ্রয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীর পড়ন্ত বিকেলের হাহাকার পরিস্ফুট। অতি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান গোপীবল্লভ গাঙ্গুলী কোম্পানীর দেওয়ানি করে বিশাল জমিদারী গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্মীসমা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মানিক অকালে বিধবা হন। পুত্রের মঙ্গলকামনার্থে আটদিন উপবাস করেন। কোজাগরীর রাত্রের শেষে এক কন্যার আবির্ভাব এবং কন্যাটিকে লক্ষ্মী মনে করে ঘরে বন্দিনী করে মানিক বৌ গঙ্গায় প্রাণবিসর্জন দেন। বর্তমানে শূন্য কুম্ভ জমিদারবাড়ী ঋণভারে জর্জরিত— সম্পদ, অর্থ সব নিঃশেষিত। উপসংহারে সংস্কার থেকে anticlimax সৃষ্টি করেছেন লেখক। অর্থের লোভে ক্ষয়ে যাওয়া তালা খুলে সকলে দেখে একরাশ বিবর্ণ চুল ও এক নরকঙ্কাল। আর একখানা নামাবলী। কিংবদন্তী ও প্রাচীন সংস্কার এই গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। গৃহে চিরদিনই লক্ষ্মীকে বন্দিনী রাখা যায় না তা লেখক তুলে ধরেছেন। এখানেও ঘটনাই প্রধান, জমিদারের ভূমিকা অপ্রধান। এখানেও জমিদারদের চরিত্র ভ্রষ্টতা ও অধোগতি তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। "যাঁরা বলেন জমিদারতন্ত্রের প্রতি তারাশঙ্করের দুর্বল পক্ষপাতিত্ব ছিল, তাঁরা যে কতটা ভুল করেন এই গল্পগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে।" (২৩)

৩) আরোগ্য ঃ— অভিশপ্ত ধনৈশ্বর্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কাহিনী। বিধবা রাসুঠাকরুণ শাঁখপুরের জমিদারবাবুর ভাগ্নী এবং রতনহাটীর জমিদার বাড়ির বউ। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর কথা না শুনে ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যান। মামাবাবুদের চাহিদা মেটাতে অনেক অর্থ খরচ হয়ে যায়। হঠাৎ ২০ বছর পর পুত্র জমিদারী কিনতে মায়ে কাছে টাকা চাইতে এসে বাক্স খুলে মাত্র বাইশ শো টাকা এবং তিনখানি গিনি পায়। পুত্র সেগুলি নিয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া করে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। রাসু ভিখারিণী হয়ে স্বামীর ভিটেয় ফিরে আসেন। "এত সুখ, এত শান্তি, এত তৃপ্তি রাসু ঠাকরুণ জীবনে আর কখনো পান নি। ঐশ্বর্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করেই তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।" (২৪)

৪) অগ্রদানী ঃ— এই গল্পটির মুখ্য ভূমিকায় পূর্ণ চক্রবর্তী। জমিদার শ্যামাদাসবাবু গল্পটির রসসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছেন। এখানে জমিদারের অর্থের প্রতি অহংকার, লোভ ও লালসার চিত্র বর্ণিত। উদর সর্বস্ব, লজ্জাহীন হীনচিত্ত পূর্ণ চক্রবর্তীকে হীনতর করার পিছনে জমিদারের অর্থ ক্রিয়াশীল থেকেছে।

৫) সন্তান ঃ— কুৎসিত, বীভৎস গোবিন্দ এই গল্পের নায়ক মূর্খ— বিয়ের জন্যে ধর্মান্তরিত হয়। বিয়ের পণের টাকা সংগ্রহের জন্যে স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীবাবুদের বাড়ীতে কাজ করে। গৃহস্থালীর কাজের ফাঁকে জমিদারবাবুর পুত্রকে দেখাশুনাও করত। একদিন গোবিন্দ পুত্রসন্তান কামনায় ছেলেটিকে ভালবাসার টানে একাত্ম করতে চাইলে লক্ষ্মীবাবু কাজ থেকে গোবিন্দকে তাড়িয়ে দেন। এরপর গোবিন্দ পুত্রসন্তান কামনায় মরিয়া হয়ে কুৎসিত রমণী মঞ্জরীকে বিয়ে করে শ্বশুরালয়ে পুত্রসন্তানের মুখ দেখতে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বর্বর পশুর মত কদাকার শিশুকে হত্যা করে। গোবিন্দ শেষে উন্মাদ হয়ে যায়। পাগলাগারদে রূপলাবণ্যময় শিশুদের ছবির ক্যালেন্ডার দেখে আপনমনে হাসে-কাঁদে। এখানেও জমিদার লক্ষ্মীবাবু গোবিন্দকে যদি সহজভাবে গ্রহণ করতেন তাহলে এমন পরিণতি গোবিন্দর জীবনে ঘটত না। জমিদার-পুত্র মানিকের আকর্ষণেই সে বিবাহ করেছে, সন্তান চেয়েছে— পুত্রের সঙ্গে সেও নাচতে চেয়েছে, কিন্তু যখনই কদর্য পুত্র দেখেছে সে পশুর মত তাকে হত্যা করেছে। কারণ গোবিন্দ বুঝেছে শিশুটিকেও এই সমাজে আঘাত, ঘৃণা, অবজ্ঞার বোঝা বইতে হবে যেটি গোবিন্দর জীবনেও ঘটেছে। সে চেয়েছিল মানিককে পুত্ররূপে পেতে। এর মূলে জমিদারেরই ভূমিকা প্রধান।

৬) শেষকথা ঃ— গল্পটির মূল কাহিনী চাষী লালমোহন পাণ্ডে ও তাঁর স্ত্রীর। জীবনের পূর্ণতা ক্ষমায় ও ভালবাসায়, সংঘাতে বা বিরোধে নয়। সাউ ও সাঁই বাবুদের পারস্পরিক সংঘাত শুরু হয়েছে জমির দখলকে কেন্দ্র করে। হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বীর বুকে মহামিলনের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে লালমোহন ও তাঁর স্ত্রী। তারা অহিংসার পথ বেছে নেয়, শুরু করে অনশন। বুড়ির মৃত্যু বুঝিয়ে দেয় ক্ষমাই মানবধর্ম। এই গল্পটির অন্তিমদৃশ্য অনিবার্য ভাবেই "কস্তুরবা'র মৃত্যুদৃশ্যকে স্মরণ করায়। টেন্ডুলকরের ইংরেজি গান্ধীজীবনী "মহাত্মা'র ষষ্ঠ খণ্ডে "কস্তুরবার মৃত্যু" অধ্যায়ে আছে **"Gandhi was visibly moved and with his wrap wiped his tears. The priest completed his ceremony, and before the pyre was set ablaze, Gandhi spoke a few faltering words, Ba, he said, had achieved her freedom; she died with 'Door Die' engrad in her heart."** (২৫)

৭) বরমলাগের মাঠ ঃ— শিবনাথ বারশো পঁচিশ টাকায় আঠার বিঘা উর্বর জমি বরমলাগের মাঠ ক্রয় করেন জমিদারের কাছ থেকে। জমিদারের এই জমির জন্যেই সমাজতন্ত্রী শিবনাথ বিষয়ী হয়েছেন। "লাঙ্গল যার জমি তার" এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েও অবিশ্বাসী হয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের যোগদানের জন্যে জোতদার বলরামকে শিবনাথ গুলি করেছে। শিবনাথের জীবনে এই উত্থান ও পরিবর্তন সবেরই মূলে ঐ শিবনাথের জমিদার বন্ধুর প্রদত্ত জমিটির ফলেই সংঘটিত হয়েছে।

৮) সর্বনাশী এলোকেশী ঃ— এখানে প্রধান চরিত্র বলরাম বৈরাগী বৈষ্ণব হয়েও মদ, মাংস খায়— বিশাল শরীর তার। সে তার ৫ বিঘা বাগান নিজে কোপায় আবার নিজের দোকানে দোকানদারী করে। হঠাৎ একদিন তার সদ্য লাগানো হেনা গাছটাকে এক দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার বাছুর মুড়িয়ে খেতে শুরু করে। বলরাম প্রচণ্ড ক্রোধে বাছুরটাকে আঘাত করে অচৈতন্য বাছুরটাকে শুশ্রূষাও শুরু করে। এ পর্যন্ত গল্পটি ঠিক ছিল কিন্তু গল্পের মাধুর্য ও রসসৃষ্টিতে জমিদার সহায়ক হয়েছেন। কারণ বাছুরটি তাঁর। জমিদার বলরাম এর জরিমানা ধার্য করেছেন ও নিজের জুতো দিয়ে প্রহার করেছেন। পরবর্তীকালে বাছুরটাকে বলরাম বাড়িতে নিয়ে আসে। নাম দেয় এলোকেশী। এই বাছুরই পরবর্তী পর্বে বলরামের জীবনে কেন্দ্রীভূত।

তালিকা - পাঁচ

'ঘ' বর্গ

১) পুরোহিত ঃ— নবীন জমিদার বিমল রায় গ্রামের জমিদার এবং কলকাতায় তাঁর কয়লার ব্যবসা।

২) মুখজ্জে মহাশয় ঃ— এই গল্পে হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রামের জমিদার কিন্তু দুই পুরুষ যাবৎ তারা কলকাতাবাসী। বালিগঞ্জে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ব্যবসার উপকরণের উল্লেখ নেই।

৩) শেষকথা ঃ— এই গল্পে সাউ ব্যবসায়ী। তিনি মিঞাদের জমিদারী ক্রয় করেন। অনেক কলকারখানার মালিক।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গর্ভজাত সামন্ততন্ত্রের চাকায় নিষ্পেষিত জমিদারের অবক্ষয়ের দিক যেমন তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনি ঐতিহ্যহীন নব্য গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ীদের অনিবার্য উত্থানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মুমূর্ষু জমিদারদের অনাচার, অত্যাচার, শোষণের চিত্র তুলে ধরলেও তাঁদের জন্যে তারাশঙ্করের মমতার অন্ত ছিল না। জমিদারদের বহুমুখী কর্মধারার সার্থক কারিগর তারাশঙ্কর।

120025 13 FEB 1998

এখন তালিকা "ক" থেকে জমিদারদের বহুমুখী কর্মধারার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে —

ক) অর্থনৈতিক ঃ—

১) জমিদার সামান্য টাকার জন্যে পেয়াদা পাঠিয়ে দরিদ্র প্রজার কুঁড়েঘরখানি লাঠির আঘাতে ভেঙে দেন [শ্মশানের পথে]

২) বিদ্রোহী প্রজাদের সায়েস্তা করে খাজনা আদায়ের জন্যে গমন [রাজা, রাণী, ও প্রজা]

৩) বিদ্রোহী প্রজাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া [রায়বাড়ি]

৪) নতুন পরগণা ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্যে দেবতার গহনা বিক্রি করতে গিয়ে কুলপুরোহিতের সঙ্গে নবীন জমিদারের সংঘাত। [পুরোহিত]

৫) জমিদারী বনাম ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব [জলসাঘর]

৬) অর্থের লোভে মানুষের চরম অধোগতি [রাখাল বাঁড়ুজ্জে]

৭) দুর্ভিক্ষের চিত্র, সরকারী খাজনা পরিশোধের জন্যে স্ত্রীর গহনা চুরির পরিকল্পনা [সমুদ্রমন্থন]

৮) দুর্বলের উপর জমিদারী শোষণ [রসকলি, ইস্কাপন, পাটনী]

৯) দারিদ্র দূর করতে দরিদ্র প্রজার দ্বারা উচ্চশিক্ষিত জমিদার প্রতারিত [ব্যাঘ্রচর্ম]

১০) জমিদার বনাম শিক্ষার লড়াই ও শিক্ষিতের জয়লাভ [নুটু মোক্তারের সওয়াল]

১১) স্বার্থান্বেষী ও অর্থলোভী জমিদার [পিঞ্জর, মা]

১২) প্রজাদের জমি খাস করিয়ে অন্যকে বিক্রি করা [বরমলাগের মাঠ]

১৩) সৎ মায়ের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সংঘাত [জন্মান্তর]

১৪) মামলা, রাহাজানি, দাঙ্গাবাজি করে প্রজাদের সর্বনাশ সাধন [নুটুমোক্তারের সওয়াল]

—— ঐতিহাসিক ঃ— মোঙ্গল সম্রাট ঔরংজেবের আমল থেকে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের উপর (খড়্গ), আবার জাতিস্মর মানুষের কাহিনী [দেহের প্রদীপে রূপের শিখা] উল্লেখ করা যেতে পারে।

সামাজিক ঃ—

১) নারীজাতির সামাজিক ভূমিকা প্রায়ই রক্ষণশীলা, আবার লোভীও বটে। দুশ্চরিত্র নারীর গৃহত্যাগের করুণ কাহিনী [বিষধর]

২) সামাজিক কুপ্রথা 'কৌলিন্য''কে নিয়ে মর্মস্পর্শী বেদনা বিধুর নারীর কাহিনী [কুলীনের মেয়ে, মুখুজ্জেমশাই]

৩) ধনীর কন্যাবলে আত্মকেন্দ্রিক, স্বামীর সুখ-দুঃখের সাথী হন না [সমুদ্রমন্থন]

৪) নারীজাতির চারিত্রিক মাধুর্য [না]

৫) চরিত্রহীন মদ্যপ জমিদারদের হাত থেকে বাঁচতে কখনও আত্মহত্যা [প্রতিমা], আবার কখনও জমিদার স্বয়ং সন্দেহের বশে সুন্দরী স্ত্রীকে হত্যা [মা]

৬) সামান্য জমিদারীর মালিক হয়ে ধনগর্ব, বংশগর্ব এদের মজ্জাগত দোষ। অকৃতজ্ঞতা, মানুষকে অপমান করা এঁরা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মনে করেন অথচ মনুষ্য সমাজে এঁরা জঘন্য চরিত্রের মানুষ [বিষধর]

৭) নিজের চূড়ান্ত অপমান সহ্য করেও তা গোপন করার ব্যর্থ প্রয়াস [মুখুজ্জেমশায়]

৮) অর্থ পিশাচ, বিধবা ভগিনী ও ভাগিনীর সর্বনাশের চেষ্টা [রাখাল বাঁড়ুজ্জে]

৯) সমাজে একশ্রেণীর দুর্মুখ, যারা সর্বদা অন্যের নিন্দা করে এমনকি পাত্র/পাত্রীর সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে [রঙীন চশমা]

১০) কৃপণ, শোষক, নিঃসন্তান, হৃদয়হীন জমিদার নিজপুত্র কামনায় অন্যের পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত। [পুত্রেষ্ঠী] আবার নিজ পুত্র কামনায় দরিদ্র মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করেছেন [অগ্রদানী]

১১) আত্মগরিমা প্রচার ও অহমিকা প্রধান [সন্তান] জমিদারতন্ত্রের চরম অধোগতি [রাজপুত্র, বন্দিনীকমলা, রসকলি, জন্মান্তর, সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার ইত্যাদি]

১২) ছাত্র জীবনের নৈতিকতাবোধ নষ্ট [হরিপণ্ডিতের কাহিনী]

সাংস্কৃতিক দিক ঃ— জমিদারগণ কেবল অত্যাচারী, ব্যাভিচারী বা শোষকই ছিলেন না। সেই সঙ্গে অনেকে কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ ভোগ করেন এবং সংবাদপত্র নিয়ে দেশ বিদেশের যুদ্ধের খবর রাখেন [ট্যারা]। আবার সৎ মানুষের প্রতি সততার মর্যাদা দানে প্রয়াসী [পণ্ডিতমশাই]। কেউ কেউ আবার বন্যার হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাতে নিজ প্রাসাদ খুলে দেন [রায়বাড়ি]। সৌন্দর্যপ্রিয় সংস্কৃতিবান জমিদার [মালাকার]। জন্তু পোষা বা শিকার করাও ছিল জমিদারগণের প্রিয়সখ [ব্যাঘ্রচর্ম, না, জলসাঘর]। শিক্ষার মান বাড়ুক, দেশীয় শিক্ষার মান উচ্চ হোক, ইংরেজদের শিক্ষার অহংকার চূর্ণ হোক তা চেয়েছেন [মধুমাষ্টার] জ্ঞানদাবাবু।

জমিদারগণের দানে পথ, ঘাট, পুকুর, বিদ্যালয় ইত্যাদি বহু কীর্তি গড়ে উঠেছে। বহু মন্দির নির্মাণ করাও তাঁদের প্রধান কীর্তি। কারণ বীরভূম জেলা একটি পীঠস্থান যা আজও সর্বজনবিদিত। "জমিদারের দানশীলতা নদীপ্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্ত পৌরুষ জাতির দুঃসাহসিকতাকে আত্মপ্রকাশের অবসর দিত।" (২৬)

বৃটিশ সরকারে রাজস্বের চাপ এবং নিজেদের বিলাস-ব্যসনের বেহিসেবী খরচ যোগাতে জমিদারগণ রায়তদের উপর খেয়াল খুশিমত রাজস্ব ধার্য করতেন, ফলে রায়তগণ ধীরে ধীরে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়; গ্রামে গজিয়ে ওঠে মহাজন নামে ধনী ব্যবসায়ীরদল। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণের যুগপৎ চাপে রায়তগণ পিষ্ট হয়। "এইসব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার অতল সমুদ্রে, সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকা অর্জনের বংশানুক্রমিক উপায়। এটা দেখতে মানবিক অনুভূমির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, ...এইসব শান্ত সরল গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, তারাই চিরকাল প্রাচ্যদেশগুলিতে স্বৈরাচারের ভিত্তি হয়ে রয়েছে, মানুষের চিন্তাধারাকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, করে রেখেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত মহিমা এবং ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। একথাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এই হীন, অনড় ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রীয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটি হিন্দুস্থানে পরিণত হয়েছে এক ধর্ম প্রথায়। এই ছোট ছোট গ্রাম গোষ্ঠীগুলি জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাইরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে।" (২৭)

একাল আর সেকালের সন্ধিক্ষণের জীবন্ত চিত্রে তারাশঙ্করের আবির্ভাব; দুই মহাযুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজের উত্থান-পতন দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন যে, এই সীমাহীন শোষণের চাকায় শোষিত নিপীড়িত মানুষ একদিন দল বাঁধবে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়। "পল্লী জীবন ও পল্লীসমাজ জীর্ণ হয়েছে; ভেঙে পড়তে গিয়ে কোনক্রমে সেই ভাঙা কাঠে, বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে, শ্মশান আসছে এগিয়ে— জমিদার মহাজন, কাবুলিওয়ালার শোষণ, তাড়ন, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, ঈশ্বরের নীরবতা গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।" (২৮) দরদি লেখক তারাশঙ্কর তাই কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব অঙ্কন করেছেন রায়বাড়ি গল্পে—হুদা শ্যামপুরের মুসলমান, বাগদী ও হাড়িরা জমিদারের অত্যাচারী গোমস্তাকে পুড়িয়ে মেরেছে।

রাজা, রাণী ও প্রজা গল্পে কৃষক রাইবল্লভ তাদের সমস্ত চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করেছে খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নুটুমোক্তারের সওয়াল গল্পে দরিদ্র চাষী মহাভারত একাই লড়াই করেছে কঙ্কনার জমিদারের বিরুদ্ধে। সাউ জমিদারদের বিরুদ্ধে লালমোহনের অহিংস আন্দোলনের জিদ শেষকথা গল্পে। এই গল্পটি গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে স্মরণ করায়। বরমলাগের মাঠ গল্পে বলরামকেও স্মরণ করা যেতে পারে।

বীরভূম জেলায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই বৈষ্ণবতীর্থ, কালীতীর্থ এমনকি শৈবতীর্থ ও বিরাজিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু সাধু-সন্ত এখানে এসেছেন। বেদে, ডোম, বাগ্দী থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণীর মধ্যেও এই ধর্মীয় শক্তির প্রাবল্য বিদ্যমান। বিশেষ করে মনসা, চণ্ডী, কালী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি এই অঞ্চলে ছড়াছড়ি। বিভিন্ন গ্রামে

অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। শক্তি পূজার পীঠস্থানও হল এই বীরভূম জেলা। "বীরভূমের কীর্ণাহার লাভপুর অঞ্চলে একাধিক গ্রামে হাড়ি, ডোম পূজিত বিখ্যাত সব কালী আছেন। ..... কীর্ণাহারের গ্রাম দেবতা ভদ্রকালী। লাভপুর তো ফুল্লরা দেবীর তান্ত্রিক পীঠস্থান বলে খ্যাত।" (২৯) তান্ত্রিক পীঠস্থান তারাপীঠ বক্রেশ্বর বিখ্যাত। তারাপীঠে সাধক বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেন। বর্তমানেও প্রতিদিন বহু দর্শনার্থীর ভিড় হয়। এছাড়া বোলপুরের সন্নিকটে অঘোরীবাবার আনন্দ কানন-এর কথা বহুজনশ্রুত। এখানে সম্পূর্ণ তন্ত্রোক্তমতে সাধনা চলত। কালীমূর্তির সম্মুখে সাধকেরা নির্জন অমাবস্যার রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে প্রধান গুরুদেব কারণবারি (রক্তচন্দনমিশ্রিত মদ্য) ভক্তদের দিতেন এবং সাধনা চলত। তারমধ্যে শবসাধনা, শিব-শিবানীদর্শন ইত্যাদির সাধনা চলত। বর্তমানে তার অনেকটাই বিলীন হয়ে গেছে। অঘোরপন্থীগণ যে ছেলে চুরি করত 'একরাত্রি' গল্পে তার উল্লেখ আছে।

আর আছে বৈষ্ণব ধর্মের কান্ত-কোমলধারা। যেমন গোবিন্দ ভক্ত কবি জয়দেবের জন্মস্থান অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে। যেখানে আজও পৌষমাসের সংক্রান্তিতে মেলা বসে, তা প্রায় এক মাস যাবৎ চলে, বহু বাউলের আগমন ঘটে। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত নান্নুর একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

রুক্ষমাটির দেশ রাঢ়, জঙ্গলে পূর্ণ। প্রত্যেক জমিদারের ইচ্ছা একে অপরকে দমিয়ে রাখতে বা নিজে নিরাপদে থাকতে। জমিদারদের মদতে প্রায়ই চুরি, ডাকাতি হত। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে শক্তি বা তান্ত্রিক সাধনার প্রাবল্য ঘটে। প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জমিদারগণের প্রায় অধিকাংশই ছিলেন তান্ত্রিক। আবার অঞ্চলবিশেষে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ছিল প্রকট। যেখানকার জমিদারগণ বৈষ্ণবীয় মন্ত্রে দীক্ষিত, সেই স্থান ছিল শান্ত; কোনরূপ অশান্তি বা উপদ্রব প্রায়শই অনুষ্ঠিত হত না। তারাশঙ্কর জমিদারগণের বিভিন্ন ধর্মের ও তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি বিভিন্নভাবে ও ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন নানা গল্পে। উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ পর্যন্ত চরিত্রগত নানা দোষ তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। জীবনের কুৎসিত প্রবৃত্তি সুন্দর নিবৃত্তিতাকেও সঠিকভাবে অঙ্কন করেছেন তিনি। তাই তারাশঙ্করের গল্প সুন্দর আর অসুন্দর, মধুর আর বীভৎসতার মহামিলন। "এই কারণেই তাঁর হাতে কোমলে কঠোরে বিচিত্র রস পরিবেশন সম্ভব হয়েছে। এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্করের সাহিত্যে কি বিপুল পরিবর্তন। শরৎচন্দ্র কেবল কোমল কেবল মধুর। জীবনের রস তীর্থে তিনি বৈষ্ণবপন্থী। তাই বাৎসল্য ও মধুর রসই তাঁর সাহিত্যে মুখ্যরস। তারাশঙ্করের চিত্তবৃত্তি নয়, মানুষের ধাতু প্রবৃত্তিরই দুর্দমনীয় বিকাশ। তাই তাঁর রচনায় মধুর ও করুণ রসের সঙ্গে রৌদ্র, ভয়ানক, এমনকি বীভৎস রসও সমান মর্যাদা পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের জীবনে রাধিকা মূর্তিরই আরাধনা, তারাশঙ্করের আরাধ্য জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্ত্তি।" (৩০)

এখন জমিদার প্রধান গল্পগুলির অন্তর্গত জমিদারদের ধর্মীয়পন্থার উল্লেখ করা যায় ঃ—

গল্পের নাম	নাম	গৃহদেব-দেবী	ধর্মীয় মতাদর্শ
১) রসকলি	জমিদারবাবুর নাম নেই।		সম্ভবতঃ তান্ত্রিক
২) রাজা, রাণী ও প্রজা	লেখক স্বয়ং		শাক্ত তান্ত্রিক
৩) খড়্গ	রাজাবাবু		শাক্ত তান্ত্রিক
৪) পুরোহিত	বিমল রায়	গোবিন্দজীউ	বৈষ্ণব তান্ত্রিক
৫) জলসাঘর	বিশ্বম্ভর রায়	বিভিন্ন দেবদেবী থাকলেও কালীমূর্তিই প্রধান	শাক্ত তান্ত্রিক
৬) রায়বাড়ি	রাবণেশ্বর রায়	" "	শাক্ত তান্ত্রিক
৭) মুখুজ্জে মহাশয়	হীরেন্দ্র মুখুজ্জে		সম্ভবতঃ শাক্ত
৮) পুত্রেষ্টি	গণেশ বাঁড়ুজ্জে		শাক্ত তান্ত্রিক
৯) রঙীন চশমা	চৌধুরী পরিবার	রাধা গোবিন্দ	বৈষ্ণব তান্ত্রিক/মদ, মাংস খাননা
১০) ব্যাঘ্রচর্ম	হেমাঙ্গবাবু		শাক্ত তান্ত্রিক
১১) জন্মান্তর	বলরাম চাটুজ্জে	লক্ষ্মীনারায়ণ	বৈষ্ণব তান্ত্রিক

	গল্পের নাম	নাম	গৃহদেব-দেবী	ধর্মীয় মতাদর্শ
১২)	না	অনন্ত		শাক্ত তান্ত্রিক
১৩)	বন্দিনী কমলা	গাঙ্গুলী (রায়/খেতাব)	শিব	কুলতান্ত্রিক/শিবভক্ত বড়কর্তা
১৪)	আফজল খেলোয়াড়ী কুমার ও রমজান শের আলী			সম্ভবত শাক্ত তান্ত্রিক

অন্যান্য গল্পগুলিতে জমিদারগণের ধর্মীয় মতাদর্শের উল্লেখ নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জমিদারগণ নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁদের মতাদর্শ নির্ণয়ে অসুবিধা হয়। 'ব্যাঘ্রচর্ম', 'না' এবং 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজানশের আলী' এই তিনটি গল্পের জমিদারগণের সখ ছিল শিকার। তার থেকেই তাঁরা যে শাক্ত ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার রাজপুত্র ও খড়্গ গল্প দুটিতে বাড়ীতে বলি হত তার উল্লেখ আছে। তার থেকেও বোঝা যায় যে তাঁরা শাক্তই ছিলেন। 'বন্দিনীকমলা' গল্পে জমিদারদের কুলধর্ম ছিল তান্ত্রিক কিন্তু পরবর্তীকালে বড়কর্তা হয়েছেন শিবভক্ত। আবার সপ্তমীর দিনে শয়তান নায়েব কিত্তিঘোষকে খুন করা হলে মানিক বৌ একেবারে অনাসক্ত জীবনধারণ করেন। পোষাকের যে বর্ণনা আছে তাতে বৈষ্ণবীয় ধর্মের সন্ধান মেলে।

খ. গোমস্তা / নায়েব / ম্যানেজার

রুক্ষ, শুষ্ক রাঢ়ের মাটিতে জন্মে বেশীর ভাগ জমিদার হয়েছিলেন হৃদয়হীন; বিশেষ করে পাঁচ সাত হাজার বাৎসরিক আয়ের অসংখ্য জমিদার ছিলেন বীরভূমে; নিজেদের দাপট ও অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁরা সর্বদাই সজাগ ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী। সেই সব জমিদারগণের কর্মচারীবৃন্দ প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে সদাপ্রয়াসী ছিল। তাই জমিদার অপেক্ষা কিছু কিছু উর্ধ্বতন কর্মচারী আরও অত্যাচারী ছিল। তারা শোষণের হাতিয়ার হয়ে প্রভুভক্ত সেনানীতে পরিণত হয়েছিল। কেউ কেউ আবার নিজের প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিল। এরা ছিদ্রান্বেষী ও স্বার্থান্বেষী। এটি জমিদারী ব্যবস্থাতে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় কলকারখানাতেও। সেখানেও মালিকের সহযোগী থেকেছে ম্যানেজার বা উর্ধ্বতন কর্মচারীর দল। শোষণের চিত্র এমনভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে। সামন্ততন্ত্র বা ধনতন্ত্রে সর্বত্রই এই শোষণের চিত্র বিদ্যমান; তা যেমন তারাশঙ্করের যুগে বর্তমান, আজও তেমনি জাতীয় জীবনে সমান ক্রিয়াশীল থেকেছে। লেখকের রচনাগুলির মধ্যে আমরা দু'ধরনের শোষণের চিত্র পাই। চিত্রটি ছকের আকার দেওয়া যেতে পারে —

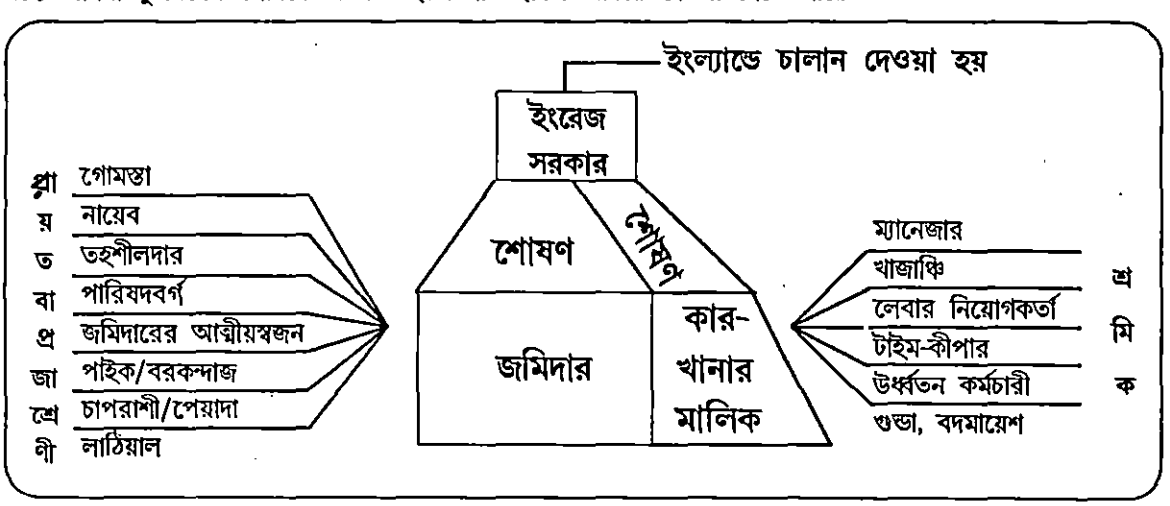

ইংরেজ সরকার কর্তৃক জমিদার ও ভূস্বামীগণ যেভাবে শোষিত হয়েছিলেন কারখানার মালিকগণ সেভাবে শোষিত হন নি, তার কারণ তৎকালীন যুগে কারখানা ছিল মুষ্টিমেয়, উপর্যুপরি কারখানার মালিকগণের অধিকাংশই কোম্পানীর কর্মচারী সংশ্লিষ্ট। তাই কারখানার উপর করের বোঝা বেশী ধার্য করলে স্বদেশীয়গণের ক্ষতি হবে বেশী। ফলে কারখানার মালিকগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন; তথাপি নিজ শোষণের চাকার ঘূর্ণন অব্যাহত রেখেছিলেন নিরীহ দিনমজুর দরিদ্র শ্রমিকদের উপর।

মুঘল যুগ থেকেই জমিদারগণই রাজস্ব আদায় করতেন। কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমি রাজস্বের যে নতুন বন্দোবস্ত হয় তার আদায়ের ভার "মোঙ্গল যুগের ভূমি রাজস্ব আদায়কারী জমিদার নায়ক কর্মচারীদেরই" (৩১) উপর দেওয়া হয়। "এইভাবেই ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আদর্শে এক নতুন ভূমি-ব্যবস্থা ও একটি নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।" (৩২)

এই নতুন ব্যবস্থা বা ফিউডাল পদ্ধতিতে যেমন জমির ব্যক্তিগত মালিক (চাষী) রাজস্বের চাপে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তেমনি জমিদারের খাজনা, আদায়কারী গোমস্তা, নায়েব থেকে শুরু করে গ্রাম্য সর্দার পর্যন্ত দরিদ্রের উপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচার চালাত। চাষীগণ যূপবদ্ধ ছাগের মত সব নীরবে সহ্য করত এবং তিলে তিলে ধ্বংসের অভিমুখী হত। অবক্ষয়ের চূড়ান্তে এসে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়েছে; রায়বাড়ি, রাজা, রাণী ও প্রজা, শেষকথা, বরমলাগের মাঠ প্রভৃতি গল্পে তার প্রমাণ মেলে। বিশেষ করে রায়বাড়ি গল্পে হুদ্দা শ্যামপুরের বিদ্রোহী প্রজারা গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীকে ফুটন্ত গুড়ের কড়াইয়ে পুড়িয়ে মারে। হয়ত গোমস্তাবাবু সেখানকার দরিদ্র কৃষকদের উপর এমনি নির্মম ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল যার ফলে তাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। সুতরাং শোষণের মাধ্যম হিসেবে এই শ্রেণীর অবদান সবচেয়ে বেশী। পণ্ডিতমশাই গল্পটিতে বর্ণিত গোমস্তা যদি ঘি কমের কথা জমিদারের কাছে না উঠাতেন তাহলে যতীন্দ্রনাথ চাটুজ্জে মশাইকে এমন হেনস্তা হতে হোত না। 'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পে প্রবীণ নায়েবের কৌশলেই গোহত্যাকারী বলরামকে জমিদারবাবুর জুতো পেটা খেয়েও একশত টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে।

কলকারখানার মালিকগণ শহরে থাকেন বিশেষ করে কলকাতায়। তাঁরা মাঝে মধ্যে কারখানা পরিদর্শনে আসেন। মালিকগণ নিজ পছন্দ অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। বৃদ্ধ কর্মচারী, যারা সারাজীবন তিল তিল করে কারখানায় কাজ করে নিজেকে নিঃশেষ করেছে অথচ সামান্য কারণেই তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছে সম্পূর্ণ নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায়। যেমন 'খাজাঞ্চি বাবু' গল্পে বৃদ্ধ খাজাঞ্চিবাবু সারাজীবন ধরে ফায়ারব্রিকস্ কারখানাটিতে কাজ করেছে, নিয়ম শৃঙ্খলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলেছে। অথচ নতুন মালিক এসে নতুন ম্যানেজার নিয়োগ করে কৌশলে বার্ধক্যের দোহাই দিয়ে ভগবানকে ডাকার পরামর্শ দিয়ে কর্মপ্রিয় খাজাঞ্চিকে বিদায় দিয়েছে। 'ময়দানব' গল্পে বৈদ্যুতিক যন্ত্র এসে প্রাচীন ফণী মিস্ত্রীর নীরবে বিদায় ঘটেছে; এমনকি কারখানাটিকে গভীর ভালবাসার জন্যেই মদ্যপ অবস্থায় কারখানায় শেষ বিদেয় নিতে গিয়ে যন্ত্রের চাকায় তার প্রাণ গেছে।

নায়েব, গোমস্তা ও ম্যানেজারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছকের আকারে দেখানো যেতে পারে —

	গল্প	নাম	ভূমিকা	চরিত্র
১।	ছলনাময়ী	নেই	কলিয়ারীর ম্যানেজার	তান্ত্রিক, প্রবৃত্তির বশে ও অর্থের লোভে জামাইকে হত্যা করে। শেষে নিজেই পাগল হয়ে যায়।
২।	জলসাঘর	তারাপ্রসন্ন	নায়েব	অত্যন্ত সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, মনিবের শুভাশুভের অংশীদার।
৩।	মুখুজ্জে মহাশয়	বিষ্ণু মুখুজ্জে	জমিদারী দেখভাল করা	অকর্মণ্য, অহং প্রধান। হীরেন্দ্রবাবু তাঁর চাকরী কেড়ে নিলেও লোক সমক্ষে তা প্রকাশ করতে পারেননি অথচ হীরুর জমিদারীর জন্যে নানারূপ শোষণ চালান।
৪।	ঘাসের ফুল	১। অতুল	কলিয়ারীর ম্যানেজার হতে চলেছেন	অসৎ প্রবৃত্তির চরিত্র, স্বার্থপর।
		২। নাম নেই	ম্যানেজার	অত্যন্ত সৎ, কর্তব্যপরায়ণ।
		৩। নাম নেই	খাজাঞ্চিবাবু	ভূমিকা নগণ্য, সৎ।
৫।	খাজাঞ্চিবাবু	১। বদিবাবু	খাজাঞ্চিবাবু	খুব হিসেবী, শোষণের সহযোগী।
		২। নাম নেই	ম্যানেজার	আধুনিক শোষণের সহযোগী।
৬।	রঙীন চশমা	নাম নেই	নায়েব	খুব সাধারণ বা সততা আছে বলে মনে হয় না।

	গল্প	নাম	ভূমিকা	চরিত্র
৭।	রসকলি	নাম নেই	গোমস্তা	চকিতে আবির্ভাব, শোষণের সহযোগী
৮।	সমুদ্রমন্থন	নাম নেই পদবী সিংহ	নায়েব	প্রভুভক্ত
৯।	রায়বাড়ি	১। ঠাকুরদাস চক্রবর্তী	গোমস্তা	অত্যাচারী, প্রজাকর্তৃক মৃত্যু
		২। নাম নেই	নায়েব	মনিবের আজ্ঞাবহ
১০।	পণ্ডিতমশাই	রাধাচরণ	গোমস্তা	খুব হিসেবী, পড়াশুনার প্রতি অনীহা
১১।	নটু মোক্তারের সওয়াল	নাম নেই	নায়েব, গোমস্তা	ভূমিকা গল্পে নেই তথাপি তারা অসৎ কারণ নটু তাদের নামেও সমন জারী করেন।
১২।	মা	রামসুন্দর	নায়েব	সম্পত্তি নেই তাই নায়েবগিরিও নেই; অতীতের স্মৃতি নিয়ে রাণীমার কাছে আছেন
১৩।	বন্দিনী কমলা	কিত্তি ঘোষ	নায়েব	অসৎ, শোষক, শঠ, জমিদারপুত্র দ্বারা খুন হন।
১৪।	হরিপণ্ডিতের কাহিনী	নাম নেই	গোমস্তা	শোষকের সহযোগী।
১৫।	ময়দানব	নাম নেই	ম্যানেজার, যুবক ম্যানেজার	উভয়েই শোষণের সহযোগী।
১৬।	সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার	বনবিহারী সরকার মিত্তির	নায়েব পরে জমিদার গোমস্তা, বনবিহারী নিয়োগ করেন	প্রজানুরঞ্জক, শঠ, স্বার্থপর।
১৭।	সর্বনাশী এলোকেশী	নাম নেই	নায়েব	শোষণের সহযোগী।
১৮।	বরমলাগের মাঠ	নাম নেই	গোমস্তা, নায়েব	শোষকের ভূমিকায় আবির্ভাব।
১৯।	জন্মান্তর	হরিহর	গোমস্তা	ভালোমানুষ, স্বভাবভীরু ।

জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে গোমস্তা ও গ্রাম্য মোড়লদের জড়িয়ে এক শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য তারাশঙ্করের গল্পে বিধৃত। জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের ফলে এদের মধ্যে যুগপৎ জমিদারদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্যাঁচ কষে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। রেষারেষি, কলহপ্রবণতা, দাপট, ছিদ্রানুসন্ধান, কুৎসা-রটনা, মামলাবাজ আবার আশ্রয়দাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্মনিষ্ঠা এই শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে ও গল্পে তা সুন্দরভাবে রূপায়িত। সামান্য নায়েব থেকে কৌশলে ও বুদ্ধির প্রাখর্যে বন্দিনীকমলা গল্পের গোপীবল্লভ জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। এই শ্রেণী, জমিদারের আশ্রয়ে থেকে তাদের মহাজনীকারবার, প্রচুর জমির মালিক বা সুদের কারবার করে প্রচুর অর্থের ও প্রতিপত্তির মালিক হয়ে ধীরে ধীরে জমিদার রূপে আবির্ভূত হতেন।

কেরাণী কর্মচারীর দল— শোষণের হাতিয়ার

ইংরেজদের মদতপুষ্ট জমিদারগণ নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বজায় রাখতে ও বেহিসাবী খরচ করার জন্যে নির্মমভাবে ভূমি রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। একা জমিদার তাঁর বিশাল এলাকায় সর্বত্র স্বয়ং উপস্থিত থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না, তাই কিছু কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন যারা ছিলেন জমিদারের শোষণের ও অত্যাচারের হাতিয়ার। জমিদার কেবল বর্ধিত অর্থ পেলেই খুশী হতেন। ফলে কর্মচারীর দল নিজ ইচ্ছামত এলাকার নিরীহ প্রজাদের

উপর শোষণ ও অত্যাচার চালাত। জমিদারকে ফাঁকি দিয়ে তারাও প্রচুর অর্থের মালিক হত। জমিদার নিজের বাহুবল প্রতিষ্ঠার জন্য গোমস্তা, নায়েব থেকে শুরু করে লাঠিয়াল, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি নামধারী কর্মচারী নিয়োগ করতেন। এরা সকলেই ছিল শোষণের সহযোগী।

—— আবার কলকারখানার মালিকগণও নিজেদের খেয়াল খুশিমত কর্মচারী, ম্যানেজার, গুন্ডা, বদমায়েস নিয়োগ করতেন। যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের ব্যবসায়ে মোটা টাকা লাভ করাই ছিল মালিকদের উদ্দেশ্য। অবশ্য তারাশঙ্করের গল্পে কেরাণী-কর্মচারীদের ভিড় অনেক কম, কারণ তিনি মূলতঃ রাঢ়ের রূপকার। নীচের ছকের সাহায্যে কেরাণী ও কর্মচারী কিভাবে জমিদার ও কারখানার মালিকদের তোষণ করত তা দেখানো হল —

গল্প	চরিত্র	ভূমিকা
১। মুখুজ্জে মহাশয়	বিষ্ণু মুখুজ্জে	জমিদারী দেখাশুনা করেন। এমন অভিনয় করেন যেন তিনি নিজেই জমিদার, এমনকি তাঁর কর্মপদ্ধতি শ্রেণী-শোষণের পথ প্রশস্ত করে।
২। রাজপুত্র	অমূল্য	কয়লাকুঠির Head Clerk । মালিকের মন জোগাতে নিজের দরিদ্র শালাকে নিয়ে গিয়েও তার সামান্য কোন চাকরির ব্যবস্থা করেননি।
৩। ইতিহাস	সাহেবগুপ্ত মেজর	মেজর হওয়া সত্বেও সামান্য ২০০০ টাকা পণ চাইতে দ্বিধা করেন না।
৪। ময়দানব	ম্যানেজার	ম্যানেজার মালিকের শোষণের হাতিয়ার। ফণীর সারাজীবন কাজ করেও যন্ত্রসভ্যতায় গজিয়ে ওঠা কৃত্রিম নব্য-মালিক ও নব্য-ম্যানেজার-এর দৌলতে চাকরি গেছে। এখানে ম্যানেজার মালিককে খুশি করেছে।
৫। কুড়ানোঘড়ি	পুলিশ ইনস্পেক্টর	অন্যায়ভাবে সৎব্যক্তিকে চোর সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে নিরীহ মানুষকে হেনস্তা করেছেন, তার আত্মসম্মানে আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি।
৬। ভ্যালচার ক্লাব	দারোগাবাবু	ভোলা ছাগল চুরি করেও থানাতে গিয়ে ছাড়া পায়। কারণ তার বাবা দারোগা। প্রশাসনকে এইভাবেই নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন দারোগা, পুলিশ কর্মচারীর দল।
৭। খাজাঞ্চিবাবু	নতুন ম্যানেজার	শোষণের মাধ্যম। পুরাতন মালিকের মন জয় করলেও নতুন মালিকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বদিবাবুর চাকরি গেছে; শোষণের মাধ্যমেরও পরিবর্তনও ঘটেছে।
৮। বিষধর	বিনয়কৃষ্ণ রায়	জমিদার ও সরকারী চাকুরে। মুখে সমাজপতির মত কথা বললেও তিনিই পূর্বে গ্রামের এক বধূকে ঘর ছাড়া করে কলকাতায় নিয়ে যান এবং কিছুদিন পর তাকে ত্যাগ করেন।

৯। রঙীন চশমা	পোষ্টমাষ্টার	মুখে 'হরে কেষ্ট' নাম অথচ স্বার্থান্বেষী। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে জমিদারের মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছিল।
১০। ভ্রমন কাহিনী	L.I.C. Agent	গল্পের কথক মহাশয়কে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল অথচ মুখে বাঙালী বলে বন্ধুত্বের নিগড়ে বেঁধে ছিল।

ঘ. পাইক/বরকন্দাজ/সিপাই

জমিদারগণের আর এক শ্রেণীর নিরীহ, শক্তিশালী, নিরক্ষর, দরিদ্র, নেশাগ্রস্ত কর্মচারী ছিল— যারা নামমাত্র বেতনে বা পেট-ভাতায় জমিদার বাড়িতে থাকত। বাড়ী পাহারা থেকে শুরু করে সংবাদবাহক, পাহারাদার এমনকি জমিদারের নিরাপত্তা রক্ষীর কাজও করত। এদের কাছে অস্ত্র হিসাবে লাঠি, বর্শা, ইত্যাদি থাকত। প্রভুভক্ত সেনানী হিসাবেই এদের কাজ। এরা মূর্খ বলেই হয়ত অত্যন্ত সরল ও বিশ্বস্ত ছিল এবং এরা কদাচ বিশ্বাসঘাতকতা করত না।

তারাশঙ্করের জমিদার প্রধান গল্প অনেক থাকলেও সেখানে পাইক/বরকন্দাজ/চাকর/চাপরাশীর বহুল পরিচয় নেই। নীচের এদের ভূমিকা কোন গল্পে কেমন তা বর্গীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল ঃ—

গল্প	চরিত্র	ভূমিকা
১। স্রোতের কুটো	রামদীন সিপাই	গোপাল জেল থেকে ফেরার সময় সামান্য টাকা কটা আধাআধি ভাগে রামদীনের কাছে রাখতে দেয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর মাত্র ৫ দিন আগের দেওয়া টাকার অর্ধেকটাও রামদীন আত্মসাৎ করেছে।
২। রসকলি	ভূতসিং/পশ্চিমা চাপরাশী	জমিদারের অত্যাচারের সহযোগী। প্রভুভক্ত।
৩। শ্মশানের পথে	পেয়াদা/খোট্টা	জমিদার অপেক্ষা অত্যাচারী, নারী-লোভী। অশ্রাব্য ভাষা-প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য মনে করে।
৪। সর্বনাশী এলোকেশী	শিউচরণ/চাপরাশী	জমিদারের আদেশে গোহত্যাকারী বলরামকে ধরে নিয়ে গেছে জমিদারের কাছে।
৫। রাজা, রাণী ও প্রজা	ভোদা, ভোম্বল,গণেশ, গজেন্দ্র, গদাধর	এরা কখনও কর্মচারী, কখনও পাইক বা বরকন্দাজ। বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে জমিদারের সহযোগী হয়েছে।
৬। মতিলাল	চাপরাশী	নিরীহ, নির্দোষ মতিলালকে প্রেসিডেন্টের আদেশে নির্দয়ভাবে প্রহার করেছে। এই শাস্তিই মতিলালের জীবনে ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটিয়েছে।
৭। সমুদ্র মন্থন	তারিণীবাগদী/চাপরাশী	বহু প্রাচীন বৃদ্ধ চাপরাশী তারিণী। প্রভুভক্ত। জমিদারের আভিজাত্য ও সম্মানহানির আশংকায় ক্রন্দন করেছে। জমিদার খাজনার টাকা পরিশোধের জন্য পাগলের মত হলে তারিণীও পাগল হয়েছে নিজ সে নাতিকে পর্যন্ত শাস্তি দিয়েছে। অত্যন্ত অন্ধস্নেহ ও প্রভুভক্ত।
	সতীশ/চাকর	ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত।

৮। রায়বাড়ি	কালীবাগদী/লেঠেল চাপরাশী/নগদী	এরা সকলেই জমিদার রাবণেশ্বর রায়ের শোষণের পথকে প্রশস্ত করেছে; বিশেষ করে কালী বাগদী যেন মহাকাল। দৈত্যের মত চেহারা নিয়ে সে দৈত্যের মতোই কাজ করে।
৯। কুড়ানোঘড়ি	কনস্টেবল	ইনস্পেক্টরের আদেশে নিরীহ এবং শান্ত ভদ্রলোকটিকে উলঙ্গ করতে দ্বিধা করেননি।
১০। চোর	জমিদারের/চাপরাশী	শাসকের মদতে নারী-লোভী হয়েছে।
১১। শ্মশান বৈরাগ্য	যোগী চাষা/চাকর	শাসকের অনুসারী হয়েছে। পেটের জ্বালায় চাকর গিরি করলেও তার হৃদয়ে দয়া মায়া ছিল। কারণ মহিম বাঁড়ুজ্জে বিধবা দিদির বাড়ীতে বিনা খরচে খেয়ে সামান্য টাকা দিদির শ্রাদ্ধের খরচ করেও সেই টাকা অনাথিনী ভাগ্নীর কাছ থেকে আদায় করেছে। ভাগ্নীর শেষ সম্বল গয়নাটুকু মহিম গ্রাস করলে যোগী তখন মেয়েটিকে তা দিতে নিষেধ করেছিল।

ঙ. শোষণ/শাসন

অষ্টাদশ শতাব্দীর নয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষকেরা কেবল জমি চাষ করার অধিকার ভোগ করত, জমি হস্তান্তরের অধিকার ছিলনা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)-এর পর থেকে জমির মালিকানা আসে জমিদার ও কৃষকদের হাতে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদার যেমন ইংরেজ সরকারকে নির্ধারিত খাজনা দিতে বাধ্য থাকত, তেমনি আবার জমি-সংশ্লিষ্ট কৃষকরাও বাধ্য ছিল বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমির খাজনা জমিদারকে প্রদান করতে। যে সব কৃষক ফসল বিক্রি করে খাজনা দিতে পারত না বা সংসার নির্বাহ করতে ফসল-বিক্রিত অর্থ ব্যয় করে ফেলত কিম্বা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে, নিজেদের জমি বিক্রি বা বন্ধক দিতে থাকে। এই ভাবেই এই সময় থেকে সমাজে গজিয়ে ওঠে নতুন এক শ্রেণী। নাম তার মহাজন। মহাজনী-কারবার করে বিত্তশালী ও অর্থশালী হয়ে পড়ে তারা। সমাজে বিশেষ করে কৃষক সমাজের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ঃ তারা গ্রাস করতে থাকে জমি, আবির্ভাব হয় ধনতন্ত্রের। **"Though the classes of money-lenders and merchants existed in the rural area of Pre-British India, their function and position in the old economy, were substantially different from those in the new economy. The money-lender in the old Indian Society played almost in insignificant role. He occasionally lent money to the village agriculturist or artisan, the interest strictly fixed by the village Panchayet. Further the money-lender could not annex the land or live stock in case a farmer did not meet the interest claim since the hand belonged to the village community."** (৩৩)

এই মহাজন গোষ্ঠী কৃষক সমাজে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে থাকে। একদিকে সুদে ঋণদান বা বন্ধকী কারবার, অন্যদিকে অল্পদামে জমি ক্রয় করা। ফলে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ব্যবসা মহাজনগোষ্ঠীর একচেটিয়া হয়ে পড়ে। নতুন বৃটিশ শাসনে ঋণগ্রস্তের জমি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকায় মহাজনদের করাল গ্রাসে কৃষকগণ ধীরে ধীরে ভূমিহীন হয়ে যায়। অনেক সময় জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পত্তনিদারগণও মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ন হন। এই যুগপৎ আক্রমনে ও শোষণে কৃষকগণ শোষিত হতে থাকে। জমিদারদের বেহিসেবী খরচ মেটাতে বা রায়তদের উপর অত্যাচার করতে তারা নব নব কর ধার্য করতে থাকেন। সরকারকে নির্দিষ্ট অর্থ রাজস্ব খাতে আদায় দিলেই সরকার সন্তুষ্ট থাকতো। বাকী উদ্বৃত্ত অর্থ জমিদারগণ নিজেদের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করতেন। ভূমিহীন কৃষক বা রায়ত দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে দিন-মজুরে পরিণত হত। তারা ভাড়াটে কৃষিমজুর বা ভাগচাষী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেকে শহরে কলকারখানায় কাজে যোগ দেয়। "১৮৪২ সালে ভারতে কোন ভূমিহীন কৃষক ছিলনা। ১৮৭২ সালে ভারতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ এবং আরও পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বাংলাদেশে কৃষিকার্যরত ব্যক্তিদের শতকরা ৩০ ভাগই দেখা গেল ভূমিহীন কৃষক।" (৩৪)

বৃটিশ সরকার মনে করতো যে জমিদার শ্রেণী ও তাদের সহযোগী মহাজন গোষ্ঠী এবং উপস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা থাকবে। জমিদার শ্রেণী বৃটিশ সরকারকে কেমন নিরাপত্তা দান করেছিল তা লর্ড বেন্টিঙ্ক এর বক্তব্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। তার বাংলা তর্জমা এমন —" আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা গণ বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। অন্যান্য বহু দিক দিয়ে, এমনকি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইলেও; ইহার ফলে এরূপ একটি বিপুল সংখ্যক ধনী-ভূস্বামী শ্রেণী তৈরী হইয়াছে যাহারা বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং জনগণের উপর যাহাদের অখন্ড প্রভুত্ব রহিয়াছে"।[৩৫] কিন্তু ক্ষুদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে যখন শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেল, তখনই তারা জমিদারী শোষণ ও বিদেশীদের চক্রান্ত উপলব্ধি করে। তারা দেখল জমিদার কি ভাবে সাধারণ শ্রেণীকে শোষণ করছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর "পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন" প্রবন্ধে জমিদার শ্রেণী রায়তদের কী ভাবে শোষণ করতেন তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বাজে আদায়, মাঙ্গন, পার্বণী ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে প্রজাদের শোষণ করতেন তারা অন্যদিকে প্রজাদের গৃহে বিবাহ, মাতৃ বা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবোৎসব বা ইষ্টক নির্মিত গৃহ নির্মাণ করতে গেলে তাঁদের জমিদারকে শুল্ক দিতে হত। কোন জমিদারীতে প্রজাদের বেগার খাটতে হত। স্বল্পতম মজুরি, কিন্তু কঠোরতম পরিশ্রম — এই ছিল দরিদ্র প্রজাদের জীবনবেদ। অকথ্য কটূক্তি এবং অনাহার ছিল তাদের নিত্যদিনের ভাগ্যলিপি।

অন্যদিকে মহাজনদের অর্থলালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে তাদের অর্থগৃধ্নুতে পরিণত করে। এই মহাজন এবং শহরের চতুর ব্যবসায়ীগণ গ্রামে এসে জমি ক্রয় করে এক একজন নব্য জমিদার হয়ে যান। আভিজাত্যের কাঙাল এই সব ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায় প্রাচীন জমিদারের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ঋণগ্রস্ত করে ধীরে ধীরে সেই সম্পত্তি গ্রাস করেছেন। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ইংরেজ কোম্পানীতে মাত্র পাঁচ টাকা মাইনেতে চাকরী করে বুদ্ধির জোরে কয়লা খনির মালিক হয়েছিলেন এবং লাভপুরে জমিদারী ক্রয় করেন — তার নাম নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। " গ্রামের এক দরিদ্র সন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠিতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকুরীতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন।" [৩৬] ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৯ এই সময়ে দুই মহাযুদ্ধের ফলে গ্রাম্য সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। কৃষিব্যবস্থা পঙ্গু হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আবির্ভাব ঘটে শিল্প সভ্যতার। বৃত্তি নির্ভর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হল। শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ নিবিড় হয়। গ্রাম্য সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত নেমে আসে। সুস্থ জীবন পঙ্গু হয়ে শাসন, শোষণ, তাড়ন এবং কাবুলিওয়ালাদের পেষণে গ্রামের চাষী-সম্প্রদায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। উচ্চবিত্তের হাতে আসে নগদ অর্থের পাহাড়, তারা হয়ে ওঠে উচ্ছৃঙ্খল। তাদের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা সমগ্র গ্রাম্য জীবনকে ক্লেদাক্ত করে তোলে। "সেকালের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক, যত ক্লেদ সমস্ত নিক্ষেপ করেছে তারা ওদেরই জীবন পাত্রে, সে জীবন পাত্র বিষাক্ত করে দিয়েছে। ওদের যুবতী বধূ-কন্যাদের প্রলুব্ধ করে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যে - চার আনা- আট আনার বিনিময়ে ভ্রষ্ট করেছে ভোগ করেছে। এমন হয়েছে যে, গভীর রাত্রে নেশার তাড়নায় কামোন্মত্ত হয়ে নির্লজ্জ-হল্লা করে ওদের পল্লীতে প্রবেশ করেছে, লাথি মেরে ঘরের আগড় বা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছে, ভীত স্বামী বা পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, বাড়ীর গৃহিণী কর্তার পৌরুষের লজ্জাকে ঢেকে নিজের নারীজনোচিত লজ্জার মাথা খেয়ে সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ করে বা বিনা দক্ষিণাতেই বধূ বা কন্যাকে সমর্পণ করেছে ভদ্রজনের কাছে, কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ করেছে, তবে শতকরা ৯৯ ক্ষেত্রে অভিভাবক অভিযোগকারীকেই ঘৃণাভরে কঠিন শাসন করে উত্তর দিয়েছেন— নিজের ঘর শাসন কর, হারামজাদা! আর কারও ঘরে না নিয়ে তোর ঘরেই বা গেল কেন? আমরাই এদের সমগ্র নারী সমাজকে এমন করে তুলছি যে এরা ক্রমে হয়ে উঠছে জন্মগত স্বৈরিণী। চারিদিকে সমাজের সকল লম্পটের দেহজ বিষ এদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে। গোটা সম্প্রদায়কে বিষাক্ত ব্যধিগ্রস্ত করে তুলেছে। বছর কয়েক আগে আমি হিসাব করে দেখেছি, এদের শতকরা ষাটটি বাড়ী আজ সন্তানহীন।" [৩৭] এমনভাবেই শ্রেণী শোষণের চিত্র ছিল সেকালে।

বিংশ শতকের প্রথমেই শুরু হয় কৃষি-সংকট, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদেশী শোষণের নগ্নরূপ। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ভূস্বামীদের মধ্যে ক্রমশঃ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়, জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের এর ফলেই জন্ম হয়। নব্য ব্যবসায়ীদের কাছে পরাজিত হয়ে এই ভূস্বামীরাই ইউরোপীয়দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জমিদারদের বংশানুক্রমিক অর্জিত অর্থ ও আধিপত্য কালের করাল গ্রাসে, নিজ চরিত্রের দোষ - ত্রুটিতে সব বিনষ্ট হয়। নানা উদ্ভট চিন্তা, বাস্তববিমুখ পরিকল্পনা, অসৎপ্রবৃত্তি তাঁদের চরিত্রে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছিল, কালক্রমে সেই সকল পরাক্রম ও বিলাসবৈভব হরণ করে তারা নিঃস্বতার প্রতীকে পরিণত হন এবং অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন (জলসাঘর)। দাপটের গল্প শুনিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে চান (সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার)।

তারাশঙ্কর জমিদার সন্তান। এদের ভালোমন্দ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসে এর সত্যও নির্মমভাবে উপস্থাপনে সার্থক। অবশ্য তিনি জমিদারদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন না। অবক্ষয়ের দিকটিকে নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে ঋজুদর্শীর মত তুলে ধরেছেন। এমন কি নিজ পূর্ব পুরুষদের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটিও সুন্দরভাবে ও সুস্পষ্ট ভাবে রূপায়ণে সফল। তিনি তাঁর পরিবারের দোষ-ত্রুটি উপস্থাপনেও দ্বিধাহীন। বাবার ডায়রি দেখে বাবার আক্ষেপোক্তিটি হুবহু উল্লেখ করেছেন—"লাভপুরে আসিয়া লোকের-সংসর্গে আসিয়া অল্প বয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল"। (৩৮)

তদানীন্তন জমিদারের এই চারিত্রিক অধোগতি অমিতব্যয়িতার ফলস্বরূপ প্রজাদের নিত্য-নতুন নির্যাতন, নিপীড়ন করেছেন তারা। কৃষককে শোষণের জন্য যে সকল পুরাতন সামাজিক নিয়মকানুন প্রয়োজন সেগুলো ক্ষয়িষ্ণু জমিদার টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জীবনের ভাঙ্গন প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে নিমজ্জমান জমিদারগণ বেঁচে থাকার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় নিত্য নতুন শোষণ চালিয়েছেন। নীচে তারাশঙ্করের ছোট গল্পে জমিদার সৃষ্ট শোষণ ও শোষিতদের চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

তারাশঙ্করের চরিত্র সৃষ্টি সুপরিকল্পিত। কয়েক ধরনের চরিত্রের সমাবেশ এখানে দেখা যায়। যেমন—মহাজন, জমিদার, গ্রামের মোড়ল প্রভৃতি, যাঁরা শোষকরূপে শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী অথবা দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষদের শোষণ করেছেন।

রসকলি—জমিদারের চকিতে আবির্ভাব। অত্যাচারী, ভ্রষ্ট চরিত্র এবং শোষকের ভূমিকায় সমাসীন। এমন আরও কয়েকটি গল্প আছে। যেমন—শ্মশানের পথে, বিষধর, প্রতিমা, রায়বাড়ি, রাজা, রাণী ও প্রজা, নুটু মোক্তারের সওয়াল প্রভৃতি। সামন্তপ্রথার চাকায় পিষ্ট পুরুষানুক্রমে চাকর বৃত্তি "সনাতন", "সমুদ্রমন্থন" প্রভৃতি গল্প।

জমিদার অলক্ষ্যে থেকে স্বকীয় দাপটের মাধ্যমে অর্থ আদায়—"পাটনী" গল্প। প্রবৃত্তিতাড়িত স্বভাবদুর্বৃত্ত লোভী শয়তানের চিত্র "রাখাল বাঁড়ুজ্জে"। এই গল্পে কীভাবে নিজ বোন ও বোনের মেয়েকে নিঃস্ব করেছে তা দেখা যায়। সুদখোর গোমস্তা শোষণ করে জমিদার হয়েছিলেন "আরোগ্য" গল্প।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে জমিদারগণ সরাসরি প্রজাদের সর্বনাশ সাধন করেছেন সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে এসেছে শ্রেণী শোষণ। এর কারণ এই যে তখনও পর্যন্ত কলোনিয়াল ইকনমির বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়নি। বাঙালী ব্যবসায় তত বেশী আত্মনিয়োগ করেন নি। তাছাড়া পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের চক্র প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে প্রবেশ করে নি। তাই রবীন্দ্রনাথের আমলে জমিদারগণ গ্রাম ও সমাজের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক। কিন্তু তারাশঙ্করের আমলে ধনতন্ত্র ব্যবসায়ী মহাজন ও যন্ত্র সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে। জমিদারগণ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে দিগভ্রান্ত হয়েছে। সমাজে পূর্ব পরিচিত ও আভিজাত্য টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়েছেন, ফলে গ্রামে বা ব্যক্তি বিশেষ প্রজার সঙ্গে জমিদারদের সরাসরি সংঘর্ষ বা সংঘাত ঘটবার অবকাশ ছিল না। তাই শোষণ ও শাসকের ভূমিকা ছিল নেপথ্যে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছিল অবশ্য প্রকাশ্যে। জমিদারগণ তাদের গর্ব, আভিজাত্য, অর্থগরিমা, বদান্যতা, শৌখিন্য বা রুচিশীলতা সবই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ব্যবসায়ী বা ধনতন্ত্রের সাথে। তাই ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সঙ্গে যে সংঘাত শুরু হয়েছে সেই সংঘাত রাবীন্দ্রিক লেখনীতে ততটা ছিল না, ছিল প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি জমিদারদের সংঘর্ষ। "শ্রম শোষণের পরিচয় নেই এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ যে শ্রেণী-সংঘাত মালিকে ও শ্রমিকে তার ছবি রবীন্দ্রগল্পে নেই।" (৩৯)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে শরৎচন্দ্রের গল্পে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের শোষণ ও শাসন এমনকি সমাজ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা সুস্পষ্ট। সেখানেও ঐ একটিই কারণ যে পুঁজিবাদের আবির্ভাব অতি প্রবল ছিল না।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে তারাশঙ্করের গল্পগুলির পর্যায়বিভাগ (পৃ-২৭), ক্রমিকসংখ্যার বিবরণ (পৃ-২৮) এবং গল্পসৃষ্টির সময়কাল (পৃ-২৯)-এ দেখানো হলো।

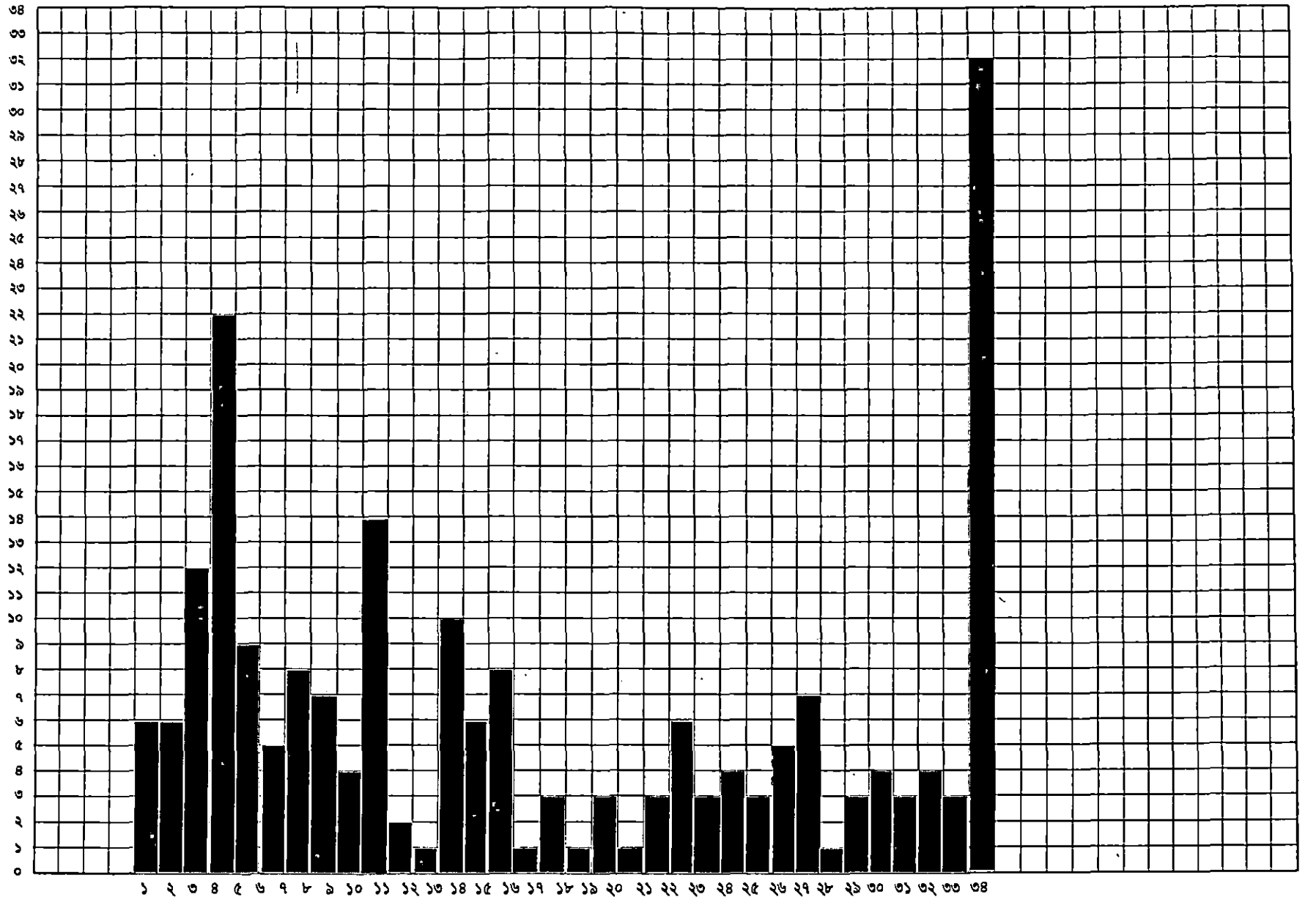

তারাশঙ্করের রচিত ১৯০ টি গল্পের পর্যায়ভিত্তিক বিভাগ (ক্রমিক সংখ্যার বিবরণ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রসঙ্গেক্রমে তারাশঙ্কর রচিত ১৯০টি গল্পের পর্যায়ভিত্তিক বিভাগের ক্রমিক-নির্দেশিকা

১। জমিদার তান্ত্রিক
২। লেখকের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত।
৩। ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি।
৪। ব্রাত্যশ্রেণীর গল্প
৫। গ্রাম্য নায়ক নায়িকা
৬। বৈষ্ণব জীবনী
৭। হাসির গল্প
৮। সামাজিক বিবর্তনের বিলীয়মান গোষ্ঠী ও বিশেষ ধারার ব্যক্তিদের নিয়ে।
৯। ছোটদের জন্যে (হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল)
১০। বস্তু নির্ভর
১১। বিকলাঙ্গ
১২। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিষ্করুণ ট্র্যাজেডি।
১৩। রহস্যময়ী নারীর বিচিত্র মানস লীলা।
১৪। মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ
১৫। শিক্ষকতাই জীবনের মূলধন।
১৬। অভিশপ্ত
১৭। বই এর আন্দোলনের পটভূমি
১৮। পশুত্ব স্বভাবের চূড়ান্তরূপ
১৯। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
২০। গান্ধীজীর মৃত্যুতে লেখা।
২১। সত্য ঘটনা
২২। ট্র্যাজেডি রিলিফ
২৩। মানবধর্মের সঙ্গে জীবধর্মের সংঘাত
২৪। প্রেমের গল্প
২৫। জীব ধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের সংঘাত
২৬। ভূত সম্বন্ধীয়
২৭। পশুদের নিয়ে
২৮। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সমপ্রাণতা
২৯। হিংসার পৃথিবীতে অহিংসার আহ্বান
৩০। কবির কল্পনা
৩১। মৃত্যু সম্পর্কে
৩২। অহংকার প্রধান
৩৩। ভ্রমণ মূলক
৩৪। অন্যান্য

❖ একই গল্প একের বেশী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তারাশঙ্করের গল্পসৃষ্টির সময়কাল

১৩৩৩ (ইং ১৯৪০) —— শিল্প কর্মে নিযুক্ত সময়কাল —— ১৩৭৮ (ইং ১৯৮৫)

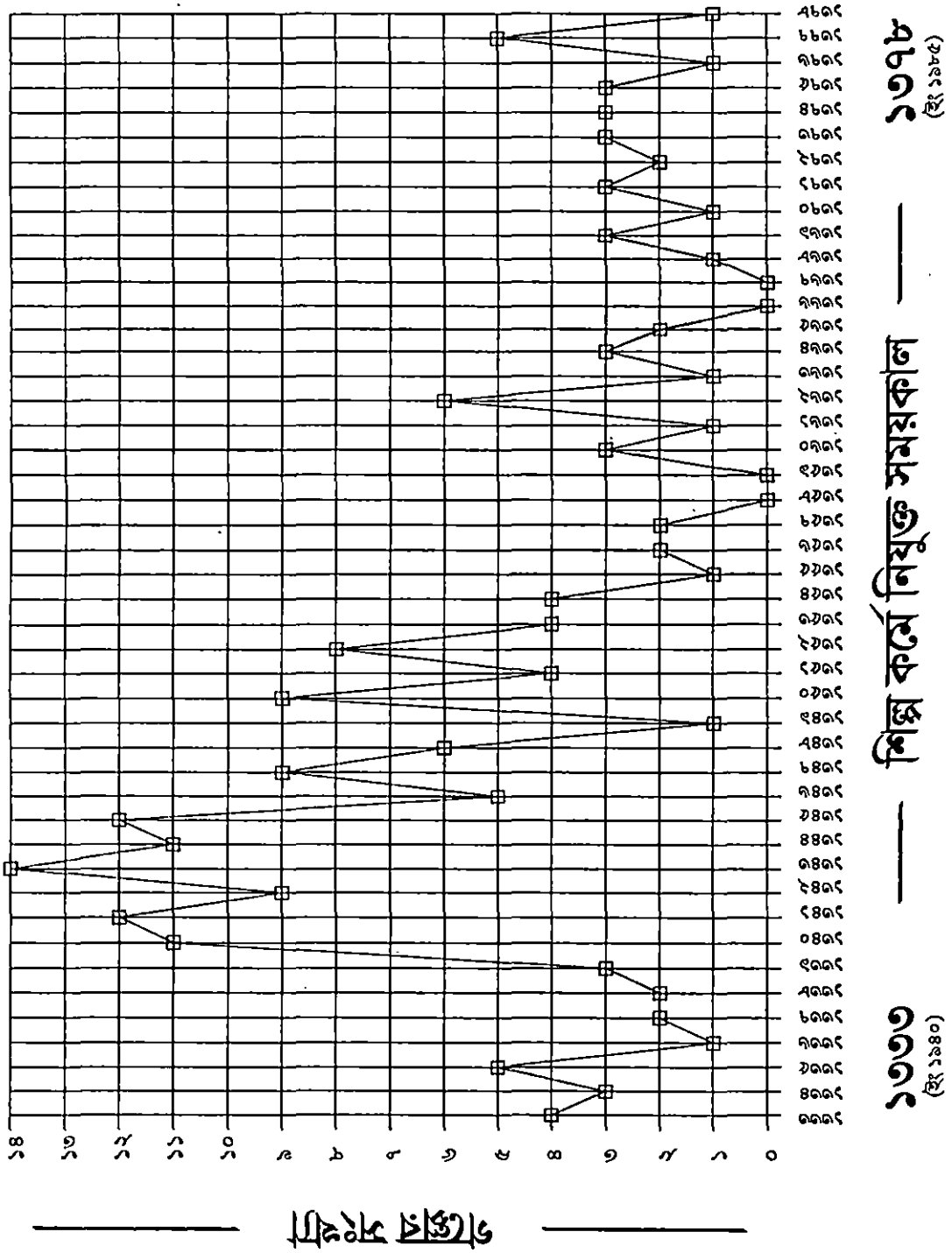

প্রথম খন্ড | দ্বিতীয় খন্ড | তৃতীয় খন্ড

❖ জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' ঃ গ্রন্থত্রয় থেকে প্রাপ্ত।

পাদটীকা

(১) আদিত্য মুখোপাধ্যায় : তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ পৃ. ১০৯
(২) ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোট গল্পের সমাজতত্ত্ব পৃ. ২৮
(৩) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃ. ৫৩৩
(৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা পৃ. ১৭
(৫) প্রাগুক্ত : " " পৃ. ১২
(৬) Tarachand : History of the freedom Movement in India P. 269
(৭) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড) পৃ.৪৯
(৮) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) পৃ.২৫৫
(৯) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড) পৃ. ৯৯
(১০) রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্পপঞ্চাশৎ (ভূমিকা) পৃ. ১৫
(১১) বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : ছোটগল্পে ত্রয়ী পৃ. ৯৬
(১২) তারাশঙ্কর রচনাবলী (১০ম খন্ড) : মিত্র ও ঘোষ পৃ. ৪৫৪
(১৩) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) পৃ. ৪৭
(১৪) রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা) পৃ. ১৭
(১৫) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিচিত্র : পৃ. ৩০
(১৬) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) পৃ. ৫৪
(১৭) রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা) পৃ. ৪২
(১৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (২য় খন্ড) পৃ. ৬২
(১৯) তারাশঙ্কর রচনাবলী (১০ম খন্ড) : মিত্র ও ঘোষ (কলিকাতা) পৃ. ৩৫১
(২০) প্রাগুক্ত : " " পৃ. ৩৫৪
(২১) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা পৃ. ২৬২
(২২) আদিত্য মুখোপাধ্যায় : তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ পৃ. ৫৬
(২৩) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড) পৃ. ৩৯
(২৪) প্রাগুক্ত " : " " পৃ. ৪০
(২৫) Tendulkar : Mahatma Vol-VI P- 238
(২৬) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃ. ৫৩৩
(২৭) মার্কস এঙ্গেলস্ : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে পৃ. ৩৭-৪৩
(২৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড) পৃ. ৪৮
(২৯) বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পৃ. ৪৯
(৩০) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প (ভূমিকা) পৃ. ৮
(৩১) সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস পৃ. ১
(৩২) প্রাগুক্ত : পৃ. ২
(৩৩) A. R. Desai : Social Back Ground of Indian Nationalism P- 177
(৩৪) ডঃ মুক্তি চৌধুরী : ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর পৃ. ২১
(৩৫) সুকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস পৃ. ৫
(৩৬) তারাশঙ্কর রচনাবলী : ১০ম খন্ড : (মিত্র ও ঘোষ) পৃ. ৩৫১
(৩৭) প্রাগুক্ত : পৃ. ৪১১
(৩৮) প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৫
(৩৯) ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব পৃ. ২৩